ঐতিহাসিকদের গবেষণায়
লেনিনের অত্যাচারী, স্বৈরাচারী,
একনায়ক শাসকের চেহারাটি
ধরা পড়েছে
— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

'দড়ি ধরে মারো টান
রাজা হবে খান খান'
— পৃঃ ১৯

৭০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ২৬ মার্চ ২০১৮।। ১১ চৈত্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

ড. আম্বেদকর

মহাত্মা গান্ধী

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

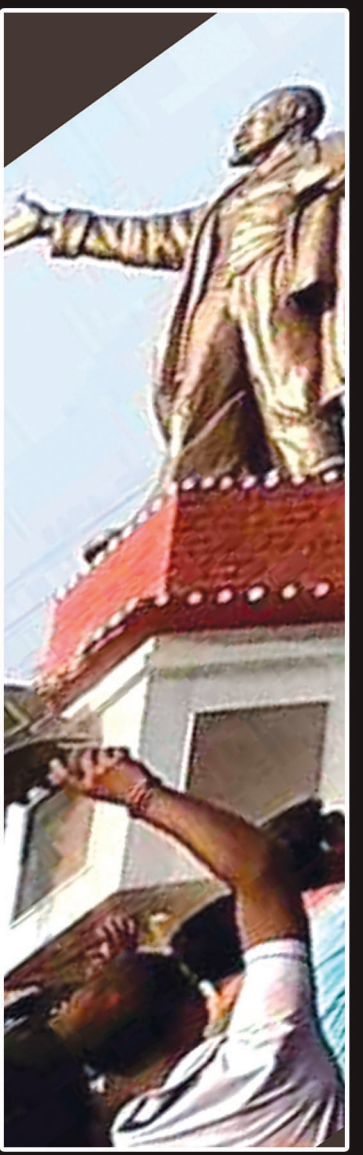

লেনিন

মূর্তি ভাঙার রাজনীতি

'পশ্চিবঙ্গে একটিও লেনিনমূর্তি ভাঙতে দেব না'— মমতা ব্যানার্জি

২০১১ সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবার পরই বিজয়গড়ে লেনিন মূর্তি ভাঙা হয়। এরপর ২০১৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে ও গড়বেতায় লেনিনমূর্তি ভাঙা হয়। তাঁর জমানাতেই হাওড়ায় জ্যোতি বসুর মূর্তিও ভাঙা হয়।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১১ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৬ মার্চ - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

কাল্পনিক তৃতীয় জোটের নেতা কে? পাপ্পু, বুয়া না দিদি?
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : কাল-বৈশাখী ঝড় এবং মেয়র, সেলাম মহানাগরিক সেলাম ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ঐতিহাসিকদের গবেষণায় লেনিনের অত্যাচারী স্বৈরাচারী, একনায়ক শাসকের চেহারাটি ধরা পড়েছে
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

সমস্ত ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারণ প্রয়োজন : আর এস এস ▯ ১৪

আধুনিক বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকল্প প্রসঙ্গে ▯ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৫

'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান'
▯ অচিন রায় ▯ ১৯

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা নিন্দনীয় হবে না কেন?
▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ২২

কংগ্রেসের হিন্দুত্ব কৌশল আর একটি রাজনৈতিক ভুল
▯ সদানন্দ ধুমে ▯ ২৭

বাংলার ব্রত 'অশোক ষষ্ঠী' ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৩১

বাংলার মুখোশ শিল্প ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩২

রাজ্যসভায় বিনয় কাটিয়ার যথার্থ বলেছেন
▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ৩৫

বাগবাজারের দত্তপরিবারের ঐতিহ্যমণ্ডিত অন্নপূর্ণা পূজা
▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাজনীতির জোট সার্কাস

আবার শুরু হয়েছে জোট সার্কাস। সম্প্রতি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে বৈঠক করে ফেডেরাল ফ্রন্টের কথা ঘোষণা করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, এই ফ্রন্টে কংগ্রেস নেই। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী জানিয়ে দিয়েছেন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীই প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হবেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার মমতা এবং মায়াবতীও। এই অবস্থায় একটাই প্রশ্ন— এঁরা কী চান? রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার কারণেই কি এঁদের এই জোটের নামে সার্কাস! স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এই দুটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ।

দাম একই থাকছে — ১০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

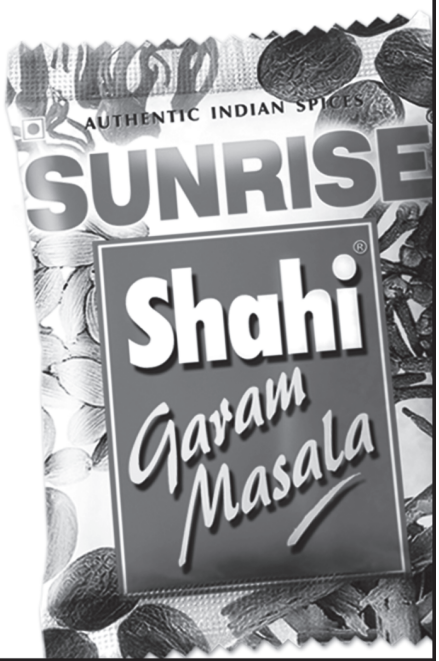

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আলালের ঘরের দুলাল

ভারতবর্ষে রাজনীতি করিতে আসিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার জন্য দায়ী তাঁহার মাতৃদেবী। বিদেশি আদব-কায়দার পরিবেশে পালিত পুত্রটির চালচলন সেই দেশের মোতাবেক হইলেও এই দেশে তাহা সম্ভব নহে। এইদেশের নাগরিকদের রক্তজল করা পয়সায় বিদেশের মাটিতে বিলাসিতার চূড়ান্ত করা যাইলেও সেই দেশে স্থায়ী বসবাস নিতান্তই বেমানান, বিশেষত যে রাজনৈতিক পরিবারের তিনি উত্তর পুরুষ। কিন্তু গোল বাঁধাইলেন তাঁহার বিদেশিনী মাতৃদেবী। তিনি পুত্রকে বোঝাইলেন রাজ্যপাট সে না দেখিলে চলিবে কেন? বিশেষত যে বিপুল সম্পত্তির চূড়ায় তাঁহার পিতৃপুরুষেরা অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা সে না দেখিলে আর কে দেখিবে?

অতঃপর ভারতবর্ষের রাজনীতির অঙ্গনে পদার্পণ করিয়া আদরের দুলালটি নিঃসন্দেহে কিঞ্চিৎ ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। বিদেশের রাষ্ট্রনীতির সহিত ভারতের রাষ্ট্রনীতির বিস্তর বৈসাদৃশ্য দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেও পরে পুলক অনুভব করিয়াছেন। নির্বাচনী রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের মতো বারবার বিপর্যস্ত হইলেও আত্মসন্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে পাণ্ডবদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অথচ তাঁহারাই রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রকে মিথ বা বাস্তবে অস্তিত্ব নাই বলিয়া সোচ্চার হইয়াছিলেন। এখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, কৌরব ও পাণ্ডবদের ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন। সত্যকে যে অস্বীকার করা যায় না, এই স্বীকারোক্তিতে তাহা আরও একবার প্রমাণিত হইল। দুর্যোধনের মতো চরিত্ররা সব জানিয়া বুঝিয়াও এইরূপ করিয়া থাকে। এই স্বীকারোক্তিকে দুর্যোধনের মতো মৃত্যুপথযাত্রীর হাহাকার ছাড়া আর কীই বা বলা যায়? ঘটনা হইল—যাঁহাকে তাঁহার মাতৃদেবী 'মৃত্যুর সওদাগর' বলিয়া দাগাইয়াছিলেন, তিনি যে স্বপ্নের সওদাগর হইয়া রাজ্যপাট কাড়িয়া লইবেন তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। রাজ্যপাট ক্রমশ হারাইতে থাকিলেও আলালের ঘরের দুলালের মতো প্রধানমন্ত্রীর (ইউপিএ) নির্দেশিত অধ্যাদেশের কপিটি ছিঁড়িয়া ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক সৌজন্য বা বাস্তববোধ নয়, ইহাতে তাঁহার অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতা প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। দেশেদ্রোহী কমিউনিস্টদের সহিত তাঁহার পারিবারিক সখ্য ছিল বটে, তবে এইবার তিনি দোসর হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন আফজল গুরুর ন্যায় মুসলমান মৌলবাদীদের অনুচরদের। কিন্তু ইহাতে সুবিধা হইল না বুঝিয়া দুলালটিকে ভেক ধরিতে হইল।

উপবীত তাঁহার পূর্বপুরুষরা কবেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন একটি নকল পৈতা কানে জড়াইতে হইল, কিন্তু ইহাতে শেষ রক্ষা হয় নাই। গুজরাটে বিজেপি সরকারই পুনরায় ক্ষমতাসীন হইয়াছে। সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হইল ২০১৯-এর আসন্ন লোকসভাকে কুরুক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়া আপনাকে পাণ্ডবদিগের একাসনে বসাইয়া ফেলা। মহাভারত সঠিকভাবে পড়িলে তিনি বুঝিতে পারিতেন—মহাভারতের যুদ্ধ ছিল অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ এবং পরিণামে ধর্মের জয়। অধর্মচারী আত্মদর্পী দুর্যোধনের পরাজয়। ম্যানেজমেন্টের মাস্টাররা তাঁহাকে বলিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবরা জয়ী হইয়াছিলেন, তুমিও নিজেকে পাণ্ডব বলিয়া ঘোষণা কর। তুমিও জয়ী হইবে। কিন্তু তাঁহারা বলেন নাই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মের জয় হইয়াছিল, অধর্মের বিনাশ হইয়াছিল। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র। যাহারা আবারও ভারতবর্ষে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বাঁধাইতে চাহিতেছেন পরাজয় তাহাদের অবধারিত। হিন্দুরা কি ভুলিবে কংগ্রেসের কারণে এই দেশভাগ, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের সহিত নেহরুর আপস, সেকুলারিজম নামক মুসলমান সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী বিষবাষ্প আনিয়া হিন্দুদের ক্ষতিসাধন, গুজরাটে করসেবকদের পুড়াইয়া মারা—হিন্দুদের ক্ষতিসাধন,—হিন্দুদের দুরবস্থার জন্য যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী তাহারা হিন্দুত্বের নামাবলী জড়াইলে নীলবর্ণ শৃগালকে কি দেশবাসী চিনিতে পারিবে না? দায়ে পড়িয়া তাহাদের কাছে আজ ভারত মহাভারতের সঙ্গে তুলনীয় হইতেছে, সেই কারণে গান্ধারীকে সকলে চিনিলেও শকুনির সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যাইতেছে না। রাজ্যে রাজ্যে তাহাদের ঘুঘুর বাসা। ২০১৯-এ সেই বাসা ভাঙিলেই ভারতের মঙ্গল।

সুভাষিতম্

আচারাৎ ফলতে ধর্ম আচারাৎ ফলতে ধনম্।

আচারাৎ ফলমাপ্নোতি হ্যাচারং নৈব লঙ্ঘয়েৎ।। (চাণক্যনীতি)

আচরণের দ্বারা ধর্মলাভ হয়, আচরণের দ্বারা ধনবৃদ্ধি হয়। আচরণের দ্বারাই সকল প্রকার সুফল প্রাপ্ত হয়। তাই আচরণ অলঙ্ঘনীয়।

তৃণমূলের রামনবমী পালন সঙ্ঘেরই জয় : জিষ্ণু বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গে সাড়ম্বরে রামনবমী পালিত হয়েছিল। মানুষের ঢল নেমেছিল রাস্তায় রাস্তায়। দেখা গিয়েছিল অস্ত্র মিছিলও। বিপদ বুঝে তৃণমূল তড়িঘড়ি হনুমান জয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ বছর অবশ্য তৃণমূল দেরি করেনি। আগেভাগেই

সাংবাদিক সম্মেলনে ড. জিষ্ণু বসু ও বিপ্লব রায়।

রামনবমী পালনের জোগাড় যন্ত্র শুরু করেছে। তৃণমূলের এই ডিগবাজিকে হিন্দুত্ববাদী শক্তিরই জয় বলে উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। বড়বাজার লাইব্রেরির প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির হার ৪৭ শতাংশ। সাপ্তাহিক মিলন এবং সঙ্ঘ মাসিক মণ্ডলী নিয়মিত ভাবে চলছে। গত কয়েক বছরে সঙ্ঘ সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সামাজিক সদ্ভাবনা, গো-সংরক্ষণ ও জৈব কৃষিপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ বিকাশের নানা কাজে হাত দিয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ ছড়িয়ে দেবার জন্য জনসংযোগ আরও বাড়ানো হয়েছে। 'জয়েন আর এস এস' পোর্টালের মাধ্যমে মানুষ এখন আরও বেশি সংখ্যায় সঙ্ঘের কাজে নিজেদের যুক্ত করছেন। এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গের ৬৫০টি জায়গায় ৯১০টি শাখা, ৭৫৭টি সাপ্তাহিক মিলন এবং ১৪৪টি মাসিক মণ্ডলী নিয়মিত চলছে। ৬৬টি ব্লকে চলছে ৪২৬টি সেবাপ্রকল্প। গ্রামীণ সেবাপ্রকল্পে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে হুগলীর তাজপুরে এবং দুর্গাপুরের লাউদোহায়। এখানকার ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত। সেবা কাজের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং স্বাবলম্বন। যার মধ্যে শিক্ষা ১৮৮, স্বাস্থ্য ১৬৯, স্বাবলম্বন ৬৯ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শহরের ১৫৬টি ওয়ার্ডে চলছে সেবাপ্রকল্প। প্রান্ত কার্যবাহ আরও জানান, উত্তরবঙ্গে ৩৭৩টি জায়গায় এখন চলছে ৩৬৯টি শাখা, ৩৩৫টি মিলন, ৮২টি মাসিক সঙ্ঘমণ্ডলী। সেবা প্রকল্প চলছে মোট ১৫৯টি। ভারতের বাইরেও ৪১টি দেশে প্রায় ১২০০ শাখা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজ্য। দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসনে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এখানে মাথা তোলার অবকাশ পায়নি। এখন অবস্থা কতটা বদলেছে? এই প্রশ্নের জবাবে জিষ্ণুবাবু বলেন, সঙ্ঘে যোগদানের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পরপর দু'বার ভারতে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। ২০১৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবার্ষিকী পালিত হওয়ার পর আমবাঙালির মধ্যে সঙ্ঘের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

সম্প্রতি কেওড়াতলায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বারেবারে জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গে জিষ্ণু বসু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিজেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, যাদবপুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম্পরা নষ্ট হতে বসেছে। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁর মতো কয়েকজন না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরিই হতো না। রানা বসু নামের এক বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে খুন করে কানাডায় পালিয়ে যায়। জিষ্ণু বসু বলেন, 'এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে আমি রানা বসুকে দেখতে পাই। এটা যেমন দুঃখের তেমনই ভয়ের।' মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গে ওঠে ত্রিপুরার কথা। সেখানে লেনিনের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। জিষ্ণু বসু সাফ জানিয়ে দেন এই ঘটনায় বিজেপি বা সঙ্ঘের কোনও কার্যকর্তা জড়িত নন। তিনি আরও জানান, লেনিনের মূর্তি জবরদখল করা জমিতে বসানো হয়েছিল। সম্প্রতি সেই জমির প্রকৃত মালিক গৌতম মজুমদার মামলা করেছেন। তাতে জানা গেছে গৌতমবাবুর দোতলা বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে সেই জায়গায় লেনিনের মূর্তি বসিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। নিজেদের কুকীর্তি ধামাচাপা দিতে সিপিএমের কিছু কর্মীই লেনিনের মূর্তি ভেঙেছে বলে কারও কারও অভিযোগ।

বড়বাজার লাইব্রেরির সাংবাদিক সম্মেলনে সম্প্রতি নাগপুরে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় গৃহীত প্রস্তাব পাঠ করে শোনানো হয়। উল্লেখ্য, মাতৃভাষার সংরক্ষণ এবং প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিনিধি সভায়। সবশেষে জিষ্ণু বসু উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বারুইপুর সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গার ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি গভীর রাতে বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে আরও বেশি সংখ্যায় রোহিঙ্গারা নদীপথে সীমান্ত পেরিয়ে তিন দফায় এসে ঘাঁটি গেড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের হাড়দহ গ্রামে। কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে সেখানে অস্থায়ী শিবির খুলে তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছে 'দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। প্রসঙ্গত, মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দিল্লির নীতি হলো, ধরো এবং সীমান্তের ওপারে পাঠাও। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর করে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিপক্ষে।

স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে জলপথে সন্দেশখালি হয়ে রোহিঙ্গাদের এ রাজ্যে প্রবেশ করানো হচ্ছে। গত ১৮ ডিসেম্বর টেকনাফ থেকে হাড়দহের শিবিরে প্রথম দফায় ২৯ জন রোহিঙ্গাকে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২২ জন এসেছে। তৃতীয় পর্যায়ে ৫৩ জন এসেছে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি। ১০ মার্চ পাঁচজন এসেছে। আর সবচেয়ে বড় দলটি এসেছে ১৩ মার্চ।

যা শুনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, ''বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি। পুলিশ সুপারকে রিপোর্ট দিতে বলেছি।'' কীভাবে সীমান্ত টপকে আসছেন রোহিঙ্গারা? বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের আইজি অঞ্জনইয়েলু বলেন, ''আমরা সতর্ক আছি। সীমান্ত টপকালে আমরা খোঁজখবর করছি।'' এর আগেও ২০ জন রোহিঙ্গা ধরা পড়ার পর তাঁদের পুশব্যাক করা হয়েছে বলে বিএসফ সূত্রের দাবি।

যদিও ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক হোসেন গাজি জানিয়েছেন, ''কক্সবাজারের টেকনাফের রোহিঙ্গা শিবিরে আমাদের অফিস রয়েছে। সেখান থেকেই মায়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের এখানে আনা হচ্ছে। টিন, বাঁশের ছাউনি দিয়ে আপাতত থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যা বেশি। ২২টি পরিবারের ১০৯ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁরা আসবেন তাঁদেরও করা হবে।''

কিন্তু এত টাকা-পয়সা আসছে কোথা থেকে? হাড়দহ শিবিরের পরিচালক হোসেন গাজির কথায়, ''৪০টির বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একজোট হয়ে এই বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।''

তবে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা রোহিঙ্গা প্রশ্নে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখছেন। বারুইপুর ব্লকের বিডিও সৌম্য ঘোষের কথায়, ''স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রোহিঙ্গারা বারুইপুরের শিবিরে মাস তিনেক আগে এসেছে বলে শুনেছি। ওঁদের বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'' স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক নির্মলচন্দ্র মণ্ডলের কথায় ''হাড়দহে রোহিঙ্গারা এসেছে, শুনেছি। এর বেশি কিছু জানি না।''

হাড়দহের শিবিরে শতাধিক রোহিঙ্গার দেখা মিললেও পুলিশের হিসেব আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা সংখ্যার মাত্র ২৬। বারুইপুরের এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''দিন কুড়ি আগে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, ওখানে ২৬ জন রোহিঙ্গা সদস্য রয়েছেন।'' বারুইপুরে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের কাছে 'ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস' স্বীকৃত একটি পরিচয়পত্র রয়েছে। বারুইপুরের এসডিপিও-র কথায়, ''হাড়দহে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের পরিচয়পত্র আসল কিনা তা খতিয়ে দেখতে দিল্লির অফিসে ওই পরিচয়পত্রের নমুনা পাঠানো হয়েছে।''

প্রশাসনিক মদতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাকে রোহিঙ্গা কলোনি বানানোর ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে সম্পূর্ণ দেশবিরোধী কাজ করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।' এর ফলে রাজ্যের জনবিন্যাস পালটে যাবে এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

গঙ্গাচেতনাযাত্রার রথে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১০ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ গঙ্গার নির্মল ও অবিরল জলধারা সচল রাখতে, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে, গঙ্গার জীববৈচিত্র্য ঠিক রাখতে গঙ্গাসমগ্র দক্ষিণবঙ্গ একটি সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করেছিল। গঙ্গাচেতনাযাত্রা নামে এই সচেতনতাযাত্রার নেতৃত্বে ছিলেন গঙ্গাসমগ্র, দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক প্রমুখ নিশীথ দত্ত ও যাত্রাপ্রমুখ পবন চৌধুরী। মা গঙ্গার বিগ্রহ-সহ সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী রথ গঙ্গাসাগর কপিলমুনির মন্দিরে পুজোপাঠের পর যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে কাকদ্বীপ, শ্যামাসুরচক, বাগাড়িয়া, ডায়মন্ড হারবারের নদীতীরে ও বজবজের নদী ঘাটের অনুষ্ঠানে রথকে স্বাগত জানান জনসাধারণ। এই রথে একটি সুসজ্জিত কলসে গঙ্গাবারি ছিল যার মাধ্যমে যাত্রাশেষে হাওড়ায় শিবাভিষেক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১১ মার্চ কলকাতার মহানির্বাণ মঠের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামীজী দ্বারা জগন্নাথ ঘাটে নির্বিঘ্নে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পূজন ও প্রবচন সম্পন্ন হওয়ার পরে ১২ মার্চ সকালে ব্যারাকপুর নবাবগঞ্জ গঙ্গার ঘাটে পূজা অনুষ্ঠান শেষে রথ হালিশহর নিগমানন্দ আশ্রমের উদ্দেশে রওনা দেয়। রথতলা মোড়ে উন্মত্ত যুবকের দল লাঠিসোঁটা-সহ রথের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। তারা গঙ্গাচেতনা যাত্রার ৫টি গাড়ি ব্যাপক ভাঙচুর করে। ট্যাবলোর সাজসজ্জা নষ্ট করে, মাইকসেট নিয়ে যায়, মোবাইল কেড়ে নেয়।

অস্তিত্বের সংকট থেকে সুকমায় মাওবাদী হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের সুকমায় মাওবাদী হামলায় সি আর পি এফের ১৩ জন জওয়ান মারা গেছেন। এই হামলা যে মাওবাদীদের ক্রমবর্ধমান অস্তিত্ব সংকটের পরিণাম সেই প্রমাণ সম্প্রতি হাতে এসেছে। খবরে প্রকাশ, হামলার ঠিক পনেরো দিন আগে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের দুটি অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই ঘাঁটি উড়িয়ে দেয়। বেশ কিছু শীর্ষনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কেউ কেউ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারাও যায়। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ডে অনেকগুলি অভিযানের মধ্যে সি আর পি এফ গিরিডিতে একটি আই ই ডি উদ্ধার করে যার মধ্যে ছিল আশি কেজি বিস্ফোরক। এই আই ই ডি রাস্তার নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। জানা গেছে, ২০১০ সালে তৈরি করা হয়েছিল আই ই ডি। আরও জানা গেছে, সুকমা হামলায় সি আর পি এফের কিস্টারাম এবং পালোডি শিবিরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে মাইন দ্বারা সুরক্ষিত একটি গাড়ি মাওবাদীদের আক্রমণে টুকরোটুকরো হয়ে যায়। সি আর পি এফের সন্দেহ এই হামলায় যে আই ই ডি ব্যবহার করা হয় তাতে বিস্ফোরকের পরিমাণ ছিল কমপক্ষে ৮০ কেজি। এর আগে মনে করা হতো জঙ্গলের রাস্তায় মাইন থেকে সুরক্ষিত (এম পি ভি) গাড়ির ব্যবহার সব থেকে নিরাপদ। কারণ ব্ল্যাকটপ রোড (ধাতব রাস্তা) খুঁড়ে বিস্ফোরক বিছিয়ে রাখা যায় না। এই প্রসঙ্গে সি আর পি এফের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, '২০১০ সালে তৈরি ব্ল্যাকটপ রোডের নীচে আই ই ডি দেখে আমরা সত্যিই অবাক হয়ে গেছি। ওই আই ই ডিতে ৮০ কেজি বিস্ফোরক ছিল। বিস্ফোরণের পর রাস্তাটা ভেঙে প্রায় চৌচির হয়ে গেছে।'

মাওবাদীদের এই বিপজ্জনক হামলার উদ্দেশ্যে কী হতে পারে? খবরে প্রকাশ, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকেই গোটা লাল করিডোর জুড়ে তৎপর ছিল সি আর পি এফ। ৩০ জন মাওবাদী নেতা হয় ধরা পড়ে, নয়তো সংঘর্ষে মারা যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই মাথার দাম ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা। ২৭টি ইনস্যাস এবং এ.কে ৪৭ রাইফেল উদ্ধার করে সি আর পি এফ। আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১১০টি আই ই ডি, ৫০০০ মিটার কোডেক্স তার, ২৪৩টি জিলেটিন স্টিক ৩১টি ডিটোনেটর এবং ২১০০ রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সি আর পি এফের ডিজি আর. আর. ভাটনগর বলেন, 'সুকমার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা বাদ দিলে আমরা বছরটা ভালোই শুরু করেছি। মাওবাদীদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিগুলো আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এসে গেছে। ঝাড়খন্ডে আমরা অসাধারণ সাফল্য পেয়েছি।'

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী তাদের প্রথম সাফল্য পায়। পালামৌ জেলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায় বেশ কয়েকজন মাওবাদী নেতা। অন্য একটি সংঘর্ষে গুলি বিনিময়ের সময় ছ'জন শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা মারা যায়। তাদের মধ্যে আছে মধ্যাঞ্চলের সিপিআই (মাওবাদী) দলের সাব জোনাল কম্যান্ডার রাকেশ ভুইঞা। যার মাথার দাম ৫ লক্ষ টাকা। মারা গেছে দুই মহিলা ক্যাডার রিংকি আর রুবি। এছাড়া ৯ জন মাওবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সব মিলিয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছিল মাওবাদীরা। সুকমার হামলা কোণঠাসা হয়ে পড়ারই পরিণাম। একথা মানছে সি আর পি এফ। তাদের বক্তব্য, সুকমায় যাই ঘটুক সি আর পি এফ লড়াই চালিয়ে যাবে। এদেশে মাওবাদের শেষ দেখে তবেই তারা ক্ষান্ত হবে।

দূষণ রোধে ব্যবস্থা না নিলে কড়া শাস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থা-সহ প্রধান নির্মাণ সংস্থাগুলি যদি দূষণরোধে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে তাদের কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে। বিশেষ করে নির্মাণ কাজের জন্য প্রচুর ধুলো ওড়ে। তাতে পরিবেশ মারাত্মক দূষিত হয়। ৩১ মার্চের মধ্যে ধুলো ওড়া ঠেকাতে কোনও ব্যবস্থা না নিলে দেশের শীর্ষ নির্মাণ সংস্থাগুলির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি পরিবেশ আইনের সংশোধন করেছে কেন্দ্র। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, যে কোনও নির্মাণকাজে ধুলো উপশমে ব্যবস্থা নেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই সূত্রেই পরিবেশ মন্ত্রক ভারতের জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থা (এন এইচ এ আই), এন বি সি সি এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনকে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছে বলে খবর। অন্যথায় কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে মন্ত্রকের পাঠানো চিঠিতে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরিবেশ মন্ত্রকের (অরণ্য এবং আবহাওয়া পরিবর্তন) সচিব সি কে মিশ্র বলেন, 'নির্মাণ কাজে ধুলো উপশমে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। পরিবেশ আইনের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলির কথা উল্লেখ করে আমরা দেশের শীর্ষ নির্মাণসংস্থা যেমন ডি এম আর সি, এন বি সি সি এবং এন এইচ এ আইকে ৩১ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছি। যদি তারা কোনও কারণে ব্যর্থ হন তাহলে আমরা কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।' পরিবেশ মন্ত্রকের সচিবের অভিযোগ, ডি এম আর সি-র এমডি মঙ্গু সিংহ, এন এইচ এ আই-এর চেয়ারম্যান দীপক কুমার এবং এন বি সি সি-র চেয়ারম্যান অনুপ মিত্তালকে পরিবেশ আইনের সংশোধনীর ব্যাপারে আগাম জানানো সত্ত্বেও তারা কোনও ব্যবস্থা নেননি। তিনি বলেন ৩১ মার্চ পর্যন্ত পরিবেশ মন্ত্রক অপেক্ষা করবে। তারপর কড়া ব্যবস্থা নেবে।

আকাশসীমা ব্যবহারে সৌদির সম্মতি

শীঘ্রই শুরু হবে ভারত-ইজরায়েল বিমান পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সৌদি আরবের সঙ্গে ইজরায়েলের চিরাচরিত শত্রুতার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরতে বাধ্য হলো সৌদি আরব। খবরে প্রকাশ, ভারত এবং ইজরায়েলের মধ্যে যে বিমান পরিষেবা চালু হতে চলেছে তার জন্য তাদের আকাশসীমা ব্যবহারের সম্মতি দিয়েছে সৌদি আরব। ভারতের বিমান পরিষবা ক্ষেত্রের মুখপাত্র প্রবীণ ভাটনগর খবরটি দিয়ে বলেন, 'এয়ার ইন্ডিয়ার ইজরায়েল ফ্লাইট শীঘ্রই চালু হবে। ভারত থেকে ইজরায়েলে পৌঁছতে সময় লাগবে সাত ঘণ্টা পাঁচ মিনিট। এই যাত্রায় তাদের আকাশসীমা ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছে সৌদি আরব।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত-ইজরায়েল বিমান পরিষেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানেয়াহু আরবের আকাশসীমা ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। সেই অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সৌদি আরবের সিদ্ধান্ত জানার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেন। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, সৌদির এই পদক্ষেপ ভারতের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত সত্তর বছর ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি সৌদি আরব। ইজরায়েলের কোনও বিমানকেও আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। সুতরাং এই পদক্ষেপ যে একান্তভাবেই ভারতের বিদেশনীতির সাফল্য সেকথা বলাই বাহুল্য।

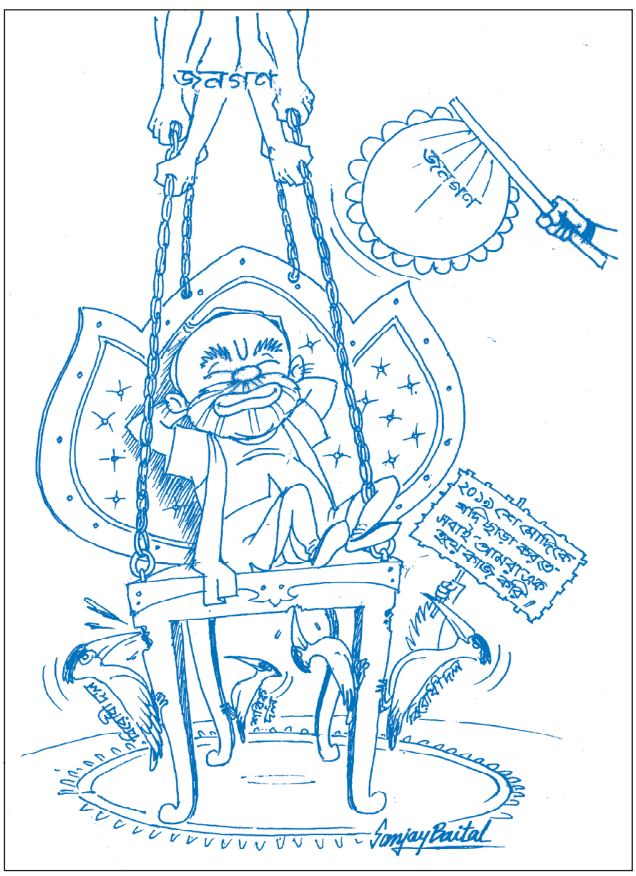

উবাচ

"ই ভি এমের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত, এ নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন দেশের গৌরব।"

কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ইভিএম বাতিল করা প্রসঙ্গে

টি এস কৃষ্ণমূর্তি
প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

"পূর্বতন বাম সরকার ত্রিপুরার বর্তমান সরকারের ঘাড়ে বিপুল পরিমাণ আর্থিক বোঝা ও ঋণ চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

শ্বেতপত্র প্রকাশ করে অভিযোগ

জিষ্ণু দেববর্মণ
ত্রিপুরা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী

"বিজেপির কাছে দেশের স্বার্থই সবচেয়ে বড়। এই দল কংগ্রেসের মতো নয়। সেখানে পরিবারতন্ত্রই কাজ চালাচ্ছে।"

অরুণাচলে পঞ্চায়েত নেতাদের বিজেপিতে যোগদানের ঢল প্রসঙ্গে

পেমা খাণ্ডু
অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী

"অযোধ্যায় কোনও দিন কোনও মসজিদ ছিল না। সুপ্রিমকোর্টের স্থগিতাদেশ উঠে গেলেই বিরাট রামমন্দির তৈরি করা হবে।"

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

স্বামী স্বরূপানন্দ
দ্বারকাপীঠের শঙ্করাচার্য

"কাশ্মীরের সুরক্ষায় সীমান্ত পেরোতে দ্বিধা করবে না ভারতের সেনাবাহিনী।"

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রসঙ্গে

রাজনাথ সিংহ
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কাল্পনিক তৃতীয় জোটের নেতা কে? পাপ্পু, বুয়া না দিদি?

গূঢ় পুরুষের কলম

উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে পাঁচটি উপনির্বাচনে পাঁচটির মধ্যে চারটি কেন্দ্রে জয়ী হয়েই বিজেপি-বিরোধীরা এমন শোরগোল ফেলে দিয়েছেন যে, মনে হচ্ছে তাঁরা ভারত জয় করেছেন। আমাদের রাজ্যে তৃণমূল দিদি এতটাই উল্লসিত যে প্রকাশ্যে স্লোগান দিচ্ছেন, '২০১৯, বিজেপি ফিনিশ'! অবশ্য দিদির কথাকে গুরুত্ব দিতে চাই না। কারণ, তিনি কয়েক দিন আগেই বলেছিলেন 'ত্রিপুরার মতো ছোট একটা রাজ্যের নির্বাচনে জয়লাভ করে বিজেপি লাফালাফি করছে। ক্ষমতা থাকলে বাংলায় দাপট দেখাক'... ইত্যাদি। হ্যাঁ, একেই বলে আত্মসন্তুষ্টি। আমি অজেয় এই অহংকার। এই আত্মম্ভরিতা ত্রিপুরায় সিপিএমকে ডুবিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর কেন্দ্রে যোগী আদিত্যনাথকে লজ্জিত করেছে। সেকথা অকপটে যোগীজী নিজের মুখেই বলেছেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে শুধু ব্যক্তি ক্যারিশ্মা নয়, প্রয়োজন মজবুত সাংগঠনিক শক্তিও। এই রাজ্যে কংগ্রেস-সিপিএম নির্বিষ শক্তিহীন হয়ে পড়ার সুযোগে দিদির দল হৈহৈ করে জিতেছে। ত্রিপুরায় বিপুল সাফল্য পাওয়ার পর বিজেপির লক্ষ্য এখন বঙ্গ বিজয়। নিঃসন্দেহে দিদিকে লোকসভার নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপির কড়া ট্যাকলের সামনে পড়তে হবে।

ভারতের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে বিজেপির দখলে এখন ২০টি রাজ্য। অমিত শাহ অবশ্য মেঘালয়ে শাসকদলের সঙ্গে থাকার সুবাদে দাবি করেছেন বিজেপি ২১টি রাজ্যে গেরুয়া পতাকা তুলেছে। যদিও মেঘালয়ে বিজেপির ফল ভালো হয়নি। বিজেপি বা মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কংগ্রেসের রাজ্যওয়াড়ি পতন শুরু। বুয়া-ববুয়ার রাজ্য উত্তরপ্রদেশে জয়ী বিজেপি। একমাত্র মিজোরাম ছাড়া দেশের উত্তরপূর্বে আর কোথাও এখন কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই। অথচ উত্তর-পূর্বের 'সেভেন সিস্টার্স'-এর প্রতিটিতে একদা কংগ্রেসই ছিল শাসকদল। এখন দেশজুড়ে ছুটছে বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়া। সামনেই কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটক রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। এই রাজ্যে জয় এলে বিজেপি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাবে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে। তারপরেই লোকসভার নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরেই যত হিসেব-নিকেশ অঙ্ক কষা। মমতা বিজেপি বিরোধী দলের জোট গড়ে নির্বাচনে জয়ী হতে চাইছেন। ইনিই সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বিজেপির অনুগ্রহে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন। তখন বিজেপি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী ভালো লোকেদের দল ছিল। এখন বিজেপি সাম্প্রদায়িক খারাপ লোকেদের দল। কেন? কারণ বিজেপি বাংলা থেকে তৃণমূল দলকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইছে। ত্রিপুরায় বিজেপি সিপিএমকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করবে এমনটা দিদি ভাবেননি। এমন অঘটন ঘটে যাওয়ার পর এখন তিনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বলছেন, সিপিএম বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছে। আবার বলছেন, বিজেপির টাকা খেয়ে ত্রিপুরায় মানুষ রাজ্যে তাদের ক্ষমতায় এনেছে। এটাতো ত্রিপুরার মানুষকে অপমান করা। মমতার প্রলাপ বকার কারণ ত্রিপুরায় সমস্ত তৃণমূল প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে।

দিল্লিতে সম্প্রতি কংগ্রেসের (এ আই সি সি) প্লেনারি সেশন বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়ে গেল। অধিবেশনে সর্বসম্মতিতে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে দেশের সমস্ত বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলকে যুক্তভাবে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন রাখা হয়েছে। গোল বেঁধেছে এখানেই। একে রাহুলের 'পাপ্পু' ইমেজ, তারপরে বামেরা নারাজ কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে। উত্তরে মায়াবতী এবং দক্ষিণে টিডিপি ও তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি, পশ্চিমে শিবসেনা কংগ্রেসের পাপ্পুকে জোটের প্রধান সেনাপতি মানতে নারাজ। উত্তরের অ-বিজেপি নেতারা চাইছেন মায়াবতীকে। দক্ষিণ ও পশ্চিমের নেতাদের ইচ্ছা তৃতীয় জোটের লাগাম মমতার হাতে তুলে দিতে। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় জোট না ঘোঁট কী হবে বোঝা যাচ্ছে না। পাপ্পু, বুয়া বা দিদিমণি বাঘের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে সেটা স্থির হতে যে বিস্তর কানাকানি হবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনের সময় বিজেপির যে জনসমর্থন ছিল তাতে এখন ভাটার টান দেখা যাচ্ছে। আর মাস দুয়েকের মধ্যেই কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটকের বিধানসভার নির্বাচন। বিজেপিকে ভালো ফল করতে হবে। তারপরেই বিজেপি শাসিত রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের ঘণ্টা বাজবে। সাম্প্রতিককালে রাজস্থানে কয়েকটি উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা হেরেছেন। ভালো রকম ভোটের ব্যবধানে। পরবর্তীকালে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর এবং ফুলপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও বিজেপি প্রার্থীদের হার হয়েছে। বিহারের আরারিয়া কেন্দ্রেও পরাজিত বিজেপি প্রার্থী। আরারিয়াতে বিজেপির পরাজয়কে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। কারণ, এই কেন্দ্রটি মুসলমান গরিষ্ঠতার জন্য 'মিনি পাকিস্তান' নামে পরিচিত। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কেন্দ্র গোরক্ষপুরের হার মন থেকে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৪-তে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর গত চার বছরে দেশে ২১টি উপনির্বাচনে বিজেপি মাত্র চারটি কেন্দ্রে জিতেছে।

তাই আর দেরি নয়। এখন কড়া হাতে সঙ্কটের মোকাবিলা করার সময় এসেছে। ■

কাল-বৈশাখী ঝড় এবং মেয়র, সেলাম মহানাগরিক সেলাম

মাননীয় মহানাগরিক মহাশয়
কলকাতা পুরসভা

মেয়রমশাই, আপনি তিন তিনটি দপ্তরের মন্ত্রী তবু আপনাকে মহানাগরিক বলেই সম্বোধন করলাম। কারণ, আপনি যে নজির তৈরি করলেন তা সত্যিই মহা, মহা নাগরিকের মতো কাজ। ক'জন আর পারে এমনটা।

মাননীয় শোভন চট্টোপাধ্যায় আপনাকে কুর্ণিশ জানাতেই হবে। আপনি দেখিয়ে দিলেন 'কিসমে কিতনা হ্যায় দম'। মনে করার চেষ্টা করুন তো, নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মহিলাকে প্রকাশ্যে একাধিকবার নিজের পরম বন্ধু বলে স্বীকার করে নেওয়ার দম আর কতজন রাজনীতিক দেখিয়েছেন!

অনেক পাবলিক ফিগারেরই 'ইন্টু মিন্টুর' কথা শোনা যায়, কানাঘুষো। বেশির ভাগই থাকে গোপনে। অপরাধ করে ধরা না পড়লে সহজে তা নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ কথা বলেন না। গোপনেই থেকে যায় সেই মহিলার আত্মত্যাগের কাহিনী।

আর আপনি একেবারে আলাদা। শুধু অধ্যাপিকা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের বন্ধু বলেই স্বীকার করেননি। টেলিভিশনের পর্দায় দৃপ্ত কণ্ঠে বলে দিয়েছেন, ''তাঁর (বৈশাখীর) উপরে কোনও আঘাত আসলে, আমি প্রথম বুকে করে সেই আঘাত নিয়ে নেব।''

বিপদের দিনে একজন মহিলা বন্ধুর এই অবদানের স্বীকৃতি শোভন আপনি দিতে পেরেছেন। অকপটে নাম নিয়েছেন বৈশাখীর। সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন নিজের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় 'বৈশাখী ফোবিয়ায়' ভুগছেন।

শুধু কি বান্ধবীকে স্বীকৃতি দেওয়া? আপনি এতদিনে শোভন চট্টোপাধ্যায় নিজের মুখেই শুনিয়ে দিয়েছেন আপনার কোন ব্যাঙ্কের টাকা কোন অ্যাকাউন্টে জমা পড়ত, কীভাবে স্ত্রীর ভরসায় ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করে দিয়েছেন, আপনার কত টাকা বেতন, আপনার পৈতৃক বাড়ি কেন ছাড়তে হয়েছে, কার বাড়িতে কীভাবে আছেন ইত্যাদি সব জানিয়ে দিয়েছেন। একজন পাবলিক ফিগারের এই 'স্বচ্ছতা' ক'জনের থাকে! তৃণমূলে তো কারও নেই। এমনকী সততার প্রতীক মমতা দিদিও এত সাহস দেখাতে পারেননি।

নিজের বৈবাহিক জীবনে অসুখী হতেই পারেন একজন মানুষ। কিন্তু সর্বসমক্ষে তা স্বীকার করে নেওয়ার হিম্মত ক'জনের থাকে? মহানাগরিকের অফিসে, মহানাগরিকের চেয়ারে বসে আপনি নিঃসংকোচে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেছেন, সাফাই দিয়েছেন, ইমোশনাল হয়েছেন। চেয়ারটার গুরুত্ব তাতে কমলেও আপনার গুরুত্ব বাড়ছে। ইদানীংকালে সব থেকে বেশি সময়ে টিভিতে মুখ দেখানোতে দিদির সঙ্গে সমানে টেক্কা দিচ্ছেন আপনি। সঙ্গে অবশ্য যোগ্য সঙ্গত করেছেন স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধু বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পরাজিত' করেছেন আপনি শোভন। শুধু তো মেয়রের চেয়ার নয়, আপনি রয়েছেন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীর চেয়ারেও। আপনার এই কাল-বৈশাখী-ঝড়েও মমতা কিন্তু তাঁর আদরের কাননকে তখন না থামাতে পারছেন, না বরখাস্ত করতে পেরেছেন মেয়রের বা মন্ত্রীর চেয়ার থেকে।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেত্রীর থেকে কী শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে কে জানে! তা উপেক্ষা করেই শোভন আপনি নিজেই ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সব বেআব্রু করে যেভাবে বুকের পাটা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে কুর্ণিশ জানাতেই হচ্ছে।

বিষয়টা শোভন না অশোভন তা নিয়ে আমি আলোচনাই চাই না। কাননদাদা শেষ দেখে ছাড়বেন প্লিজ।

—**সুন্দর মৌলিক**

ঐতিহাসিকদের গবেষণায় লেনিনের অত্যাচারী স্বৈরাচারী, একনায়ক শাসকের চেহারাটি ধরা পড়েছে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

১৯১৭ সালে অক্টোবর (মতান্তরে নভেম্বর) বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্র বামপন্থীরা ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ওরফে লেনিনকে সর্বহারা শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর মুক্তিদাতা হিসেবে পূজার আসনে বসিয়েছে। ১৯২১ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্টদের বিশ্বব্যাপী লেনিন পূজার ফলে ব্যক্তি লেনিন ক্রমশ মিথে পরিণত হন। ফলে, লেনিনকে কেন্দ্র করে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই হিমঘরে চলে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপে যতদিন কমিউনিস্ট শাসনের রমরমা ছিল ততদিন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের পূজাই হয়েছে সর্বত্র, লেনিন চরিত্রের কোনও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হয়নি। সোভিয়েতের পতনের পর কমিউনিস্ট জমানার অনেক অজানা তথ্য যখন প্রকাশ পেতে থাকে, তখনই বোঝা যায় লেনিন চরিত্রটি খোদ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতেই শ্রদ্ধা উদ্রেককারী চরিত্র ছিলেন না। বরং সন্ত্রাস এবং অত্যাচারের প্রতিমূর্তিই ছিলেন লেনিন। যদিও ভারতের কমিউনিস্টরা এখনও লেনিনকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করেন। লেনিন চরিত্রের কালো দিকটি এঁরা স্বীকারই করতে চান না। কিন্তু এঁরা চান বা না চান, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের গবেষণায় যে তথ্য উঠে আসছে, তাতে লেনিনের স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, একনায়ক শাসকের চেহারাটিই ধরা পড়ছে। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অপসারণের পর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা কেরেনস্কিকে সরিয়ে ক্ষমতা দখলের পর রাশিয়ায় সবাই যে খুব খুশি মনে লেনিনের শাসন মেনে নিয়েছিল ব্যাপারটি কিন্তু এমন নয়। বরং ক্ষমতা দখলের পরই লেনিনের স্বৈরাচারী এবং নির্মম একনায়কের রূপটি প্রকাশ পেতে থাকায় অনেকেই আতঙ্কিত

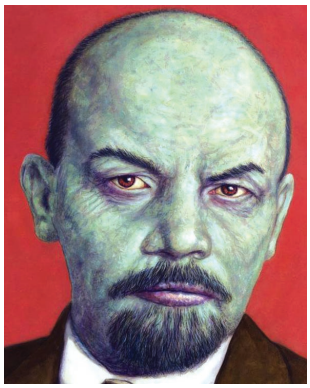

হয়েছিল। ক্ষমতা দখল করেই রাশিয়ায় সমস্ত রকম নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করেছিলেন লেনিন। দিকে দিকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালু করে বিরোধীদের বন্দি করে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। গঠন করা হয়েছিল চেকা নামক এক রাষ্ট্রীয় ঘাতক বাহিনী। বিচারের নামে প্রকাশ্যে হত্যা এবং গুম খুন শুরু হয়ে গিয়েছিল লেনিনের সম্মতিতেই। বলশেভিকদের হাতে বন্দি দ্বিতীয় জার নিকোলাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল জার নিকোলাসের শিশুপুত্রদেরও।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই চেকার মতো গুপ্ত বাহিনী বা লাল ফৌজ গঠনের পাশাপাশি পিপলস কমিশারেট ফর ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স (এন কে ভি ডি) গঠন করলেন লেনিন। এর দায়িত্ব দিলেন জেরঝেনস্কিকে। দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি লেনিন নির্দেশ দিলেন— প্রতি বিপ্লবীদের (বলশেভিকদের বিরোধী) দমন করতে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এমনকী সন্ত্রাসের মাধ্যমেই এদের দমন করতে হবে। ১৯১৮-র ৬ জানুয়ারি প্রাভদা এবং ইজভেস্তিয়া এই দুই সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধে লেনিন প্রকাশ্যেই বললেন, 'বিপ্লবের স্বার্থে সন্ত্রাস করতেই হবে।' (সূত্র : লেনিন, স্তালিন অ্যান্ড হিটলার— রবার্ট জেলাটলি) বিপ্লবের স্বার্থে লেনিনের এই সন্ত্রাসের রূপটি কেমন ছিল?

লেনিন খুব সহজে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করতে পারেননি। বরং কেরেনস্কির সমর্থক সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাঁকে। বিনা বাধায় কেরেনস্কির বাহিনী বলশেভিকদের হাতে ক্রেমলিন প্রাসাদ তুলে দিতে চায়নি। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারী, ছাত্র, যুব, সেনা এমনকী শ্রমিকদের একটি অংশও লেনিনের নেতৃত্ব মেনে দিতে অস্বীকৃত ছিল। বলশেভিকরা সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করলেও এই শ্রেণীর ভিতর ক্ষোভের আগুন জ্বলছিলই। জারের সাম্রাজ্যের পতনের পর এরা চেয়েছিল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক রাশিয়ায়। লেনিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন না। লেনিন চেয়েছিলেন কমিউনিস্টদের একনায়কত্ব।

১৯১৮-র ৫ জানুয়ারি, কমিউনিস্ট বিরোধীরা একটি প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে তুরিদ প্রসাদের দিকে এগতে থাকে। এই প্রতিবাদ মিছিলে অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রতিবাদ মিছিলে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ছাত্র-যুবদের প্রতিনিধি। প্রতিবাদ মিছিল দমন করতে লেনিন নির্দেশ দিলেন তাঁর লালফৌজকে। লাল ফৌজ নির্বিবাদে মিছিলের ওপর গুলি চালালো। পঞ্চাশ জন ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। সবাই যে তাঁর শাসন মেনে নিচ্ছে না, এটা বুঝতে পেরে আরও কঠোর হলেন লেনিন। ১৯১৮-র গ্রীষ্মে যে কটি বিরোধী রাজনৈতিক দল ছিল রাশিয়ায় সেগুলিকে নিষিদ্ধ করা হলো। বিরোধীদের হাতে থাকা পত্র-পত্রিকাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। ১৯১৮-র জুন মাস থেকে নতুন করে চালু হলো মৃত্যুদণ্ড। নৌবাহিনীর বিদ্রোহী অ্যাডমিরাল শেসাসনিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে

প্রকাশ্যে গুলি করে মারা হলো। লেনিন এই মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে সাফাই দিয়ে ১৯১৮-র ৫ জুলাই একটি সভায় বললেন, 'বিশ্বের কোনও বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ হত্যা ব্যতীত সংঘটিত হয়নি। ভণ্ডামি না করতে চাইলে এই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করবেন না। (সূত্র : লেনিন, স্তালিন অ্যান্ড হিটলার— রবার্ট জেলাটলি)

অবশ্য, সোভিয়েত জমানার অবসানে বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে ঐতিহাসিকরা দেখেছেন, ১৯১৭ সালেই ১৪ হাজার সম্পন্ন কৃষককে (কুলাক) লেনিনের নির্দেশে বলশেভিকরা হত্যা করে। ১৯১৮-য় ওই বিদ্রোহ দমনের পর লেনিন আরও নৃশংস পন্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিলেন তাঁর পার্টি কমরেডদের। এই নির্দেশগুলির ভিতর ছিল— (১) যে পাঁচটি প্রদেশে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিচ্ছে, তা নির্মমভাবে দমন করতে হবে। (২) অন্তত একশো সম্পন্ন কৃষক এবং ধনী মানুষকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। সবাই যাতে দেখতে পায় এমন জায়গায় তাদের ফাঁসি দিতে হবে। (৩) তাদের সমস্ত শস্য অধিগ্রহণ করতে হবে। (সূত্র : দ্য আননোন লেনিন— ফ্রম দ্য সিক্রেট আরকাইভ— রিচার্ড পাইপস)

শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের নয়নের মণি বলে যাঁকে উল্লেখ করতে ভালোবাসেন বামপন্থীরা, সেই লেনিনের প্রতি কতখানি ক্ষোভ এবং আক্রোশ জমা হয়েছিল তাঁর দেশের মানুষের মনেই যে ওই সময় লেনিনের প্রাণনাশের চেষ্টা হয় রাশিয়াতেই। ১৯১৮ সালেই ফ্যানি ক্যাপলান নাম্নী এক মহিলা লেনিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। মারাত্মক জখম হলেও প্রাণে বেঁচে যান লেনিন। হামলার পর সুস্থ হয়ে উঠে দলীয় কমরেডদের গোপন নোটে একটি কমিশন গঠন করতে নির্দেশ দিলেন লেনিন। 'খুব গোপনে এবং তাড়াতাড়ি এই কমিশন গঠন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া'— লিখলেন লেনিন। (সূত্র : দ্য আননোন লেনিন— ফ্রম দ্য সিক্রেট আরকাইভ)

লেনিনের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য ১৯১৮-র ৩ সেপ্টেম্বর পার্টি পত্রিকায় গুপ্ত ঘাতক বাহিনী চেকা-র ডেপুটি হেড আই. কে. পিটার্স লিখলেন, 'সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে কোনও রকম কাজকর্মে জড়িত থাকলেই ধরে নিয়ে গিয়ে হয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে অথবা তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারা হবে।' ওই একই পত্রিকায় স্তালিন লিখলেন, 'খোলাখুলি গণসন্ত্রাস নামিয়ে আনতে হবে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তাদের এজেন্টদের ওপর।' (সূত্র : দ্য চেকা-লেনিনস পলিটিকাল পুলিশ— জর্জ লেগেট)। লেনিন, স্তালিন এবং তাঁদের সহযোগীদের এইসব বক্তব্যের পর ১৯১৮-র সেপ্টেম্বরে পেত্রোগ্রাদে ৫০০ মানুষকে হত্যা করল চেকা। বেসরকারি হিসেবে অবশ্য সংখ্যাটা ১৩০০-র বেশি। ওই সময়ই মস্কোতে জারের মন্ত্রীসভার ২৫ জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হলো। ৭৬৫ জন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধিকে হত্যা করা হলো। ১৯১৮-র সেপ্টেম্বরে শুধু ক্রিমিয়াতেই ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করল চেকা। এবং এই সমস্ত হত্যার আদেশনামায় স্বাক্ষর করলেন স্বয়ং লেনিন। (সূত্র : দ্য চেকা--- লেনিনস পলিটিকাল পুলিশ)। লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৯২১ সালে নৌসেনারা বলশেভিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কনস্টাড নৌবিদ্রোহ নামে যা আজও রাশিয়ার ইতিহাসে পরিচিত। এই বিদ্রোহ দমন করতে ৪০০ সেনাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল লেনিনের উত্তরসূরী স্তালিনের নির্দেশে। ১ হাজার বিদ্রোহীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

লেনিনের নির্দেশেই রাশিয়ায় প্রথম কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালু হয়। এই ক্যাম্পগুলি মূলত ছিল বিরোধীদের ওপর অত্যাচারের জায়গা। অত্যাচারের জন্য এই ক্যাম্পগুলি কালক্রমে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। এই ক্যাম্পগুলিতে বন্দিদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে, তাও লেনিন নির্দেশ দিয়েছিলেন। লেনিন লিখেছিলেন— 'একটি জায়গায় ধনী, গুণ্ডা আর অলস (লেনিন 'অলস' বলতে বোঝাতে চেয়েছেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়) শ্রেণীর মানুষদের বন্দি করে রাখতে হবে। দ্বিতীয় একটি জায়গায় তাদের দিয়ে নিয়মিত শৌচাগার পরিষ্কার করাতে হবে। তৃতীয় জায়গায় তাদের প্রত্যেককে একটি করে হলুদ কার্ড দেওয়া হবে— যাতে সবাই বুঝতে পারে এরা সন্দেহজনক এবং এদের ওপর সবাই নজর রাখতে পারে। যারা এতকিছুর পরও বশ্যতা মানবে না, চতুর্থ জায়গায় তাদের নির্বিচারে গুলি করে মারা হবে। আর পঞ্চম একটি জায়গা থাকবে, যেখানে মিশ্র প্রকৃতির অত্যাচার চালানো যেতে পারে।' (সূত্র : লেনিন, স্তালিন অ্যান্ড হিটলার)

বিপ্লবের পর লেনিন অবশ্য বছর চারেক বেঁচেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সন্ত্রাসের ঘরানা চালু করে দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরও সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ বিশ্বের সব কমিউনিস্ট শাসিত রাষ্ট্রগুলিই সেই সন্ত্রাসের ঘরানাতেই বিশ্বাস রেখেছে। লেনিনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন যুগে এই অত্যাচার ভয়াবহতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। রুমানিয়ার সিসেস্কু, চীনের মাও জে দং, কম্বোডিয়ার পল পট বা বর্তমান উত্তর কোরিয়ায় কিম— অত্যাচারে এঁরা এক একজন অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট জমানায় অত্যাচার কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা বিশদে জানা যায় নোবেলজয়ী রুশ সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সলঝেনেৎসিন এবং রুশ বিজ্ঞানী আন্দ্রে শাখারভের লেখায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রুশ মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, কমিউনিস্ট শাসনের ৭০ বছরে সোভিয়েত রাশিয়ায় অন্তত ৬ কোটি মানুষকে প্রকাশ্যে অথবা গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কম্বোডিয়ায় পলপটের শাসনকালে দেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশকে হত্যা করা হয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন অবসানের পর কমিউনিস্ট শাসনের ভয়াবহতা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে প্রাগ শহরে একটি কমিউনিস্ট মিউজিয়াম চালু করেছে তারা।

কমিউনিস্ট শাসন অবসানের পর এক হাজারেরও বেশি লেনিন মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল রুশ জনগণ। পূর্ব ইউরোপের অন্য সব কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও কমিউনিস্ট শাসন অবসানের পর লেনিন মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। লেনিন মূর্তির ওপর তাদের এই আক্রোশই বলে দেয়, পূর্বতন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে জনগণ কখনই লেনিনকে শ্রদ্ধার আসনে বসাননি। লেনিন নামক কমিউনিস্ট নেতাটি তাদের কাছে ছিলেন নিছক অত্যাচার এবং সন্ত্রাসের প্রতীক।■

সমস্ত ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারণ প্রয়োজন : আর এস এস

গত ৯-১১ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক সম্পন্ন হয় নাগপুরে। বৈঠকে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে দেখা যাচ্ছে সারাদেশে ৩৭২৪৮ স্থানে ৫৮৯৬২ শাখা চলছে। এছাড়া সাপ্তাহিক মিলন ১৬৪০৫ এবং সঙ্ঘমণ্ডলী ৭৮৭৩টি চলছে। সেইসঙ্গে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩১৯টি সেবা কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও সঙ্ঘের শাখা নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাপ্তাহিক মিলন এবং মাসিক মণ্ডলী নিয়মিত ভাবে চলছে। সঙ্ঘ সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সামাজিক সদ্ভাবনা, গো-সংরক্ষণ ও জৈব কৃষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ বিকাশ ইত্যাদি নানাবিধ কাজে অগ্রসর হচ্ছে। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক, জয়েন আর এস এস পোর্টালের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, ছাত্র ও যুবকরা বহু সংখ্যায় সঙ্ঘকাজে নিজেদের যুক্ত করেছেন। বিভিন্ন সেবাকাজ এবং অন্যান্য সামাজিক গতিবিধির কারণে সঙ্ঘের কাজ বৃদ্ধি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে মোট ৬৫০ স্থানে ৯১০টি শাখা, সাপ্তাহিক মিলন ৭৫৭, মাসিক মণ্ডলী ১৪৪ এবং ৬৬টি ব্লকে ৪৬২টি সেবা প্রকল্প চলছে। যার মধ্যে শিক্ষা-১৮৮, স্বাস্থ্য-১৬৯, স্বাবলম্বন-৬৯, সামাজিক-৩৬ এবং বিভিন্ন শহরের ১৫৬টি ওয়ার্ডে অনুরূপ সেবা প্রকল্প চালানো হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে ৩৭৩ স্থানে ৩৬৯ শাখা, ৩৩৫ মিলন, ৮২ মাসিক সঙ্ঘ মণ্ডলী; সেবা প্রকল্প মোট ১৫৯টি। ভারতের বাইরে ৪১টি দেশে প্রায় ১২০০ শাখা চলছে। নাগপুরে প্রতিনিধি সভার বৈঠকে 'সমস্ত ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারণ প্রয়োজন বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় :

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মনে করে, ভাষা হলো কোনও ব্যক্তি ও সমাজের আত্ম পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং তার সংস্কৃতির এক সজীব বাহক। দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি, উদাত্ত পরম্পরা, উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং বিপুল সাহিত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে অত্যন্ত সহায়ক। সৃজনশীল চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সাহিত্য অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি জ্ঞান মৌখিক পরম্পরারূপে সংগীত, প্রবাদবাক্য, লোককথা প্রভৃতিতে বিদ্যমান।

বর্তমানে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও উপভাষার প্রচলন এবং ব্যবহার কমে যাওয়া, শব্দের বিলোপ এবং বিদেশি শব্দের প্রতিস্থাপন এক গুরুতর সংকটরূপে সামনে এসেছে। ইতিমধ্যে অনেক ভাষা ও উপভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে এবং বহু ভাষার অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মনে করে যে, দেশের বিবিধ ভাষা ও উপভাষার সংরক্ষণ এবং প্রসারণের জন্য সরকার, নীতিনির্ধারক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-সহ সমগ্র সমাজের সমস্ত রকমের প্রয়াস করা উচিত। এজন্য কয়েকটি প্রয়াস বিশেষভাবে করণীয় ঃ

(১) সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষা অথবা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতেই করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে অভিভাবকরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হোন এবং সরকার এই লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় বিধান রচনা করুক।

(২) প্রযুক্তি ও চিকিৎসা-সহ উচ্চশিক্ষার সমস্ত স্তরে শিক্ষণ, পাঠ্য সামগ্রী এবং পরীক্ষা ভারতীয় ভাষায় সুলভে করতে হবে।

(৩) উচ্চশিক্ষায় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট এবং ইউ পি এস সি-র দ্বারা আয়োজিত সমস্ত পরীক্ষা ভারতীয় ভাষায় নেওয়া আরম্ভ হয়েছে। এই পদক্ষেপ প্রশংসাযোগ্য। সেই সঙ্গে এখনও যেসব প্রবেশিকা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতীয় ভাষায় করা হচ্ছে না, সেখানেও এই বিকল্প সুলভে করতে হবে।

(৪) প্রশাসনিক ও আদালতের সমস্ত কাজে ভারতীয় ভাষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের নিযুক্তি, পদোন্নতি এবং সমস্তপ্রকার কাজকর্মে ইংরেজি ভাষাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ভারতীয় ভাষাকে দিতে হবে।

(৫) স্বয়ংসেবক-সহ সারা সমাজকে দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনে মাতৃভাষাতেই কথা বলতে হবে। সমস্ত ভাষা ও উপ-ভাষাগুলির সাহিত্য-সংগ্রহ এবং পঠন-পাঠনের পরম্পরা প্রসারিত করতে হবে। সেই সঙ্গে এগুলির নাটক, সংগীত, লোককলা প্রভৃতিরও সংরক্ষণ করতে উৎসাহ দিতে হবে।

(৬) ভাষা সমাজকে সংযুক্ত করার মাধ্যমস্বরূপ। তাই সকলেরই নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রতি স্বাভিমান বজায় রেখে অন্য ভাষার প্রতি সম্মানের ভাব রাখতে হবে।

(৭) সমস্ত ভারতীয় ভাষা, লিপি ও উপভাষাগুলির সংরক্ষণ ও প্রসারণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা শেখার পক্ষে। সেইসঙ্গে ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে আমাদের সংস্কৃতির বাহক ভাষাগুলির সংরক্ষণ ও প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তাই প্রতিনিধি সভা সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জনসঞ্চার মাধ্যম, ধর্মীয় সংগঠন, শিক্ষা সংস্থা এবং বুদ্ধিজীবীমহল-সহ সমগ্র সমাজের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে যে, দৈনন্দিন জীবনে ভারতীয় ভাষার ব্যবহার এবং তার ব্যাকরণ, শব্দচয়ন ও লিপিতে পরিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত করে তার প্রসারণের সকল রকম প্রয়াস হোক। ■

আধুনিক বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকল্প প্রসঙ্গে

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতার জ্ঞানচর্চার একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সেই ১৭৮৪ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি এশিয়া তথা ভারতের বৈষয়িক ও মানসিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধানের কাজে নিমগ্ন। ভারতকে শাসন করার জন্য এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ভূগোল, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রয়োজনীয়তা বুঝে লিখেছিলেন, ''If you are to rule India, you have to know India।'' শাসন ও বাণিজ্যের কাজ হাসিল করার জন্য এই স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেন। এই প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই এশিয়াটিক সোসাইটি আত্মপ্রকাশ করে। উদ্যোক্তা ছিলেন উইলিয়াম জোনস। পরে পাশ্চাত্যবিদ্যা প্রসারের সূচনা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এশিয়াটিক সোসাইটির কাজকর্ম শুরু হয়।

বিদেশি পণ্ডিতদের সঙ্গে ভারতের জ্ঞানী বিজ্ঞানী ব্যক্তিরা এশিয়াটিক সোসাইটির আবর্তে যুক্ত হন। স্যার আশুতোষের মতো ব্যক্তিরাও সোসাইটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে শুরু করে আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখের গবেষণা পত্র সোসাইটির বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও সোসাইটিতে পক্ষপাতশূন্য জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত ছিল।

কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান :

ক্রমশ সোসাইটি পরিচালনায় আর্থিক সংকট দেখা দেয়। সদস্য ও গুণগ্রাহীদের ব্যক্তিগত চাঁদা ও অনুদানে এর ব্যয়ভার চলতো। কিন্তু সোসাইটির কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সরকারি অনুদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে হুমায়ুন কবীর ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী। তাঁর প্রচেষ্টায় সোসাইটির নতুন ভবন নির্মিত হয়। এখানেই ঐতিহ্যমণ্ডিত লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামের স্থান নির্দিষ্ট হলো। এদিকে কর্মচারী ও গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব দেখা দেয়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার আর্থিক অনুদান দিতেন, কিন্তু তার পরিমাণ আশাব্যঞ্জক ছিল না। এই অবস্থায় ১৯৮৪ সালে সোসাইটির দ্বিশতবর্ষ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। চন্দন রায়চৌধুরী, নিমাইসাধন বসু প্রমুখের আবেদনে সাড়া দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিলেন। 'গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান' (An Institution of National Importance) হিসাবে শিরোপা পেল এশিয়াটিক সোসাইটি।

দলতন্ত্রের আখড়া :

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে গত শতকের আশির দশক থেকেই বামপন্থী দলগুলি বিশেষত সিপিআই (এম)-এর কর্তৃত্ববাদী কাজকর্ম ও দাপট শুরু হয়। অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মতো এখানকার পরিচালনা সরাসরি কেন্দ্রের হাতে নেই। সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত কাউন্সিলের হাতে পরিচালনার দায়ভার রয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির অন্দরে

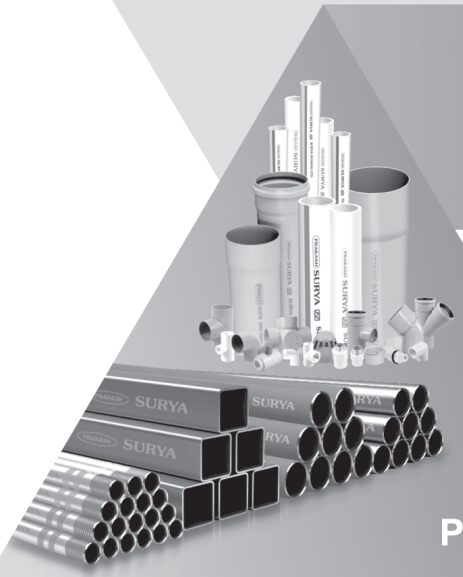

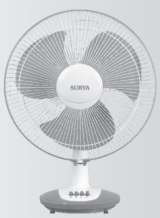

SURYA
Energising Lifestyles
LIGHTING
Innovative
DESIGN
World-class Quality
PRODUCTS
PIPES
APPLIANCES
Just One Name
SURYA
FANS
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni

দলবাজি শুরু হলো। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র যেমন নিয়ন্ত্রণ দলের হাতে, সেরকম দলীয় অনুগত ব্যক্তিদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার তোড়জোড় হলো এশিয়াটিক সোসাইটির চত্বরে। সিপিআই (এম)-এর মতো কৌশলী দল সোসাইটির কাউন্সিল দখলের জন্য নিজ অনুগামীদের সদস্যপদে ঢোকাতে লাগল, কারণ সদস্যদের ভোটেই কাউন্সিল সদস্যরা নির্বাচিত হন। ১৯৯০ থেকে সুচারুভাবে সদস্য পদে নিজেদের সমর্থকদের নিয়ে এল। ২০০০ সাল থেকে তাদের মনোনীত প্রার্থীরা কাউন্সিল ও অন্যান্য কর্মকর্তার পদে আসীন হলো। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছি বিরোধীরা দুশোর বেশি ভোট পান না, বাম অনুগামী প্যানেলের প্রার্থীরা পাঁচশো ভোট কব্জা করে ফেলেন। রহস্য হলো দেড় হাজার সদস্যের বেশিরভাগ তাদের হাতে। বিগত এনডিএ আমলেও বামপন্থীরা সহজেই এশিয়াটিকের মসনদ দখলে রেখেছিল। কেন্দ্রে কংগ্রেসের জোটের সরকার থাকলে সোনায় সোহাগা। আর এনডিএ এলেও এশিয়াটিক সোসাইটি তাদেরই হাতে থাকে।

দলতন্ত্রের সুবাদে অনুগামীরাই ছড়ি ঘোরান। বিভিন্ন উপসমিতিতে তাদের অনুগামীদের প্রাধান্য। বিগত দু'দশকের উপসমিতিগুলির সদস্যদের নামধাম খতিয়ে দেখুন। এর মধ্যে অবশ্য 'বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক' মুখোশের ছাপ দেখতে পাবেন। গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব তারাই দেন। আগে বাংলা অভিধানে অধ্যাপক পবিত্র সরকার ছিলেন মুখ্য পরিচালক। এখন যে ইতিহাস প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার মুখ্য পরিচালক হলেন জেএনইউ-এর প্রাক্তন অধ্যাপক ও আই সি এইচ আর-এর বিগত চেয়ারম্যান অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য। ইতিপূর্বে অধ্যাপক বরুণ দে ছিলেন বাংলার বাম প্রগতিশীল ইতিহাসচর্চার মুখ্য কাণ্ডারি। ১৯৭০-এর দশকে ভারতের শিক্ষাঙ্গণে, বিশেষত ইতিহাস চর্চায়, বামমার্গীরা কেন্দ্রের কংগ্রেস শাসনের দাক্ষিণ্যে শিরোনামে আসেন। কলকাতার সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ও নব্বইয়ের দশকে প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস নির্মাণ শুধু তথ্যের পশরা নয়, অথবা ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত মতবাদের প্রতিফলন নয়। ইতিহাস দেশ ও জাতির মর্মবাণী।

মৌলানা আজাদ এশিয়ান স্টাডিজ-এর প্রধান কর্তা ছিলেন বরুণ দে।

বাংলার ইতিহাস সংকলন প্রকল্প :

আমরা সবাই জানি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে 'বাম- প্রগতশীল'দের একাধিপত্য। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস কংগ্রেসের ৭৮তম অধিবেশন বসে। মধ্যমণি ছিলেন অধ্যাপক ইরফান হাবিব ও ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক কে এম শ্রীমালি। কমিউনিস্ট হিসেবে তাঁদের পরিচিতি সুবিদিত। যাদবপুরে ইতিহাস কংগ্রেসে এশিয়াটিক সোসাইটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। আবার এশিয়াটিকে অনুষ্ঠিত প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও শিল্পকলা সংক্রান্ত আলোচনা চক্রে মূল ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীমালি। এরপরেই ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি আধুনিক বাংলার (১৭০০-১৯৫০) সম্পূর্ণ ইতিহাস (Comprehensive history of Modern Bengal, 1700-1950) নামে সংকলন প্রকল্পের রচয়িতাদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রকল্পের কর্ণধার হলেন অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য। কর্মশালার উপস্থিত ছিলেন অমিয় বাগচী, অনিরুদ্ধ রায়, সুমিত সরকার প্রমুখ। সোসাইটির সহ-সভাপতি সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী ও ইতিহাস উপসমিতির সম্পাদক অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুদিনের কর্মশালার তদারকি করলেন। বোধ করি এরকম কর্মশালা করে ইতিহাস রচনা সঠিক পদ্ধতি নয়, আরোপিত ছকে বাঁধা ইতিহাস এমনটাই হয়।

বাংলার ইতিহাস প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার ইতিহাস দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। এ দুটি গ্রন্থ প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা নেন আচার্য যদুনাথ সরকার ও আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার। স্বাধীনতার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড সঙ্কলিত করে (১৭৫৭-১৯০৫)। সম্পাদনা করেন অধ্যাপক এন. কে. সিংহ। পরবর্তীকালে ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে বাংলাদেশের ইতিহাস সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখন বোধকরি পুরাতন ঘরানার ইতিহাস বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মনঃপুত নয়। ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লিগ শাসনে বাংলার দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক কীর্তি এগুলিকে বুঝি নতুন ভাবে সাজাতে হবে। স্বাধীন অখণ্ড বাংলা গড়ার অপচেষ্টাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান গঠনের সমর্থক ছিল। তাদের ভূমিকা নবকলেবরে সাজাতে হবে। 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'-এর বিকৃতি ঘটাতে হবে। 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা'কে কীভাবে বিদ্ধ করা যায় তার প্রচেষ্টা দেখা যাবে। শ্যামাপ্রসাদ কীভাবে পাকিস্তানের গর্ভে পশ্চিমবাংলাকে ঢোকাতে দেননি সেই বীরোচিত সংগ্রামকে ফিকে করতে হবে।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী, ড. নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ বাংলার ইতিহাস রচনায় যে সুর ও ব্যঞ্জনা দেখিয়েছিলেন তা কি নতুন কালের 'বাম প্রগতিশীল' ঐতিহাসিকেরা তুলে ধরতে পারেন? ইতিহাস নির্মাণ শুধু তথ্যের পশরা নয়, অথবা ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত মতবাদের প্রতিফলন নয়। ইতিহাস দেশ ও জাতির মর্মবাণী। বাংলার উপজাতীয়তাবাদকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত ইতিহাসের মূল স্রোতকে উপেক্ষা করা হবে না তো! শ্রী অরবিন্দ উইলিয়াম আর্চার রচিত "India and the Future" গ্রন্থের ভারত-বিরোধিতার বিরুদ্ধে 'ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি' লিখেছিলেন। ভারতের উন্নত, সৃজনশীল মনন ও সভ্যতাকে তুলে ধরেছিলেন। ভারতের ইতিহাস চর্চায় ছিদ্রান্বেষী মনোভাব থেকে বিরত থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি কি চিন্তার দাসত্ব থেকে উত্তীর্ণ হবে? ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

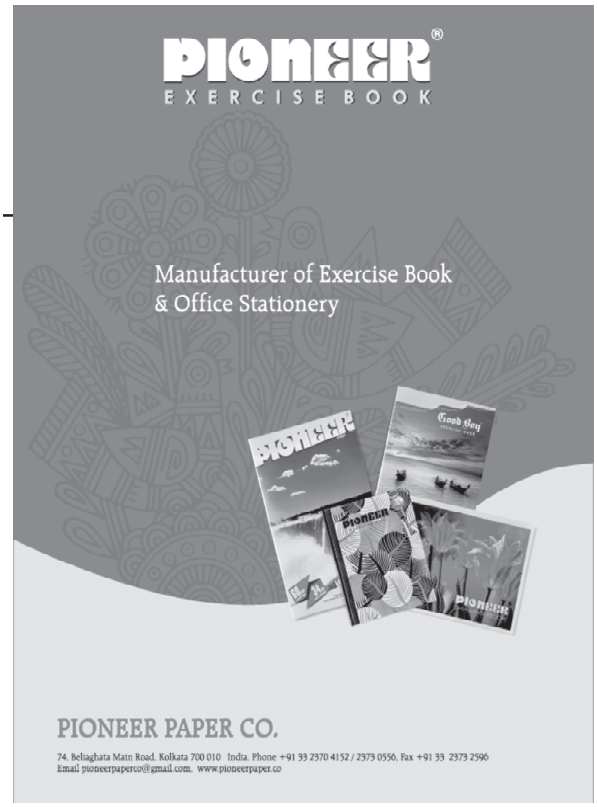

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

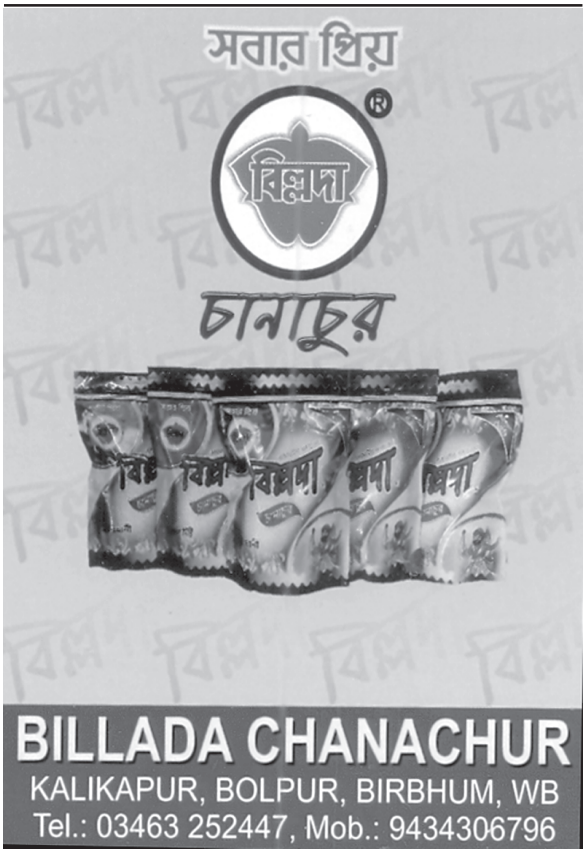

‘দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান’

অচিন রায়

সম্প্রতি গেরুয়াঝড়ে ত্রিপুরার লালদুর্গ পপাত ধরণীতলে। এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যেমন প্রচলিত ছিল যে বামফ্রন্টের কোনও বিকল্প নেই, বামফ্রন্টের বিকল্প একমাত্র উন্নততর বামফ্রন্ট। সপ্তমবারের উন্নততম বামফ্রন্ট আর উন্নতির দিশা দেখাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আপন পুঞ্জীভূত পাপের ভারে ভেঙে পড়ে। কিন্তু তার জন্য, সম্মিলিত গণ উদ্যোগে বিরোধীদের দড়ি ধরে টান দেওয়ার ফলেই লাল রাজা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে।

সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিতে লাল কাপড়ে আবৃত হীরক রাজার মূর্তিকে ধরাশায়ী করতে ‘দড়ি ধরে মারো টান’ স্লোগানটি ব্যবহার করেছিলেন। হয়তো রূপকার্থে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের লালে লাল রাজনীতির অবসানকল্পে। কিন্তু জমানা পরিবর্তনের পর এখানে যে কমিউনিস্ট দেবতাগুলি রাস্তাঘাট আলো করেছিল, তার ওপর হাত পড়েনি। সঙ্গত কারণেই বোধহয়; কেননা জমানা বদল হলেও নতুন বোতলে সেই পুরনো মদই রাজত্ব করে। কিন্তু ত্রিপুরার ঘটনা অন্য ধারার সূচনা করে। তাই দড়ি ধরে টানাটানিতে কমিউনিস্ট পিতৃদেবতার মূর্তি ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। বোধ হয় হিন্দু রীতিতেই দেবমূর্তির বোধনের পর আসে বিসর্জনের পালা। তাই আমাদের একটি ছড়া আছে, ‘ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ ঠাকুর যাবি বিসর্জন’।

তবে মুশকিল হলো, রাজনীতির ঠাকুররা একবার বেদীতে বসতে পারলে আর বিসর্জনের কথা মনে আনতে পারে না। কিন্তু জীবনের অমোঘ নিয়মে বিসর্জনের পালা আসেই। তখনই হয় মূর্তিভাঙার পালা। কমিউনিস্ট ভেকধারী বামপন্থীরা অবশ্য ভাবতেই পারে না যে, তাঁদের দেবতার সমুন্নত শির কোনওদিন ধুলায় গড়াগড়ি যেতে পারে। কেননা তাদের অস্তিত্বই হলো বাস্তবের দিকে চোখ ফেরানো সমাজবাদের অনন্ত অবস্থান নিয়ে আত্মবঞ্চনার মোহগর্তে। মার্কসবাদী ভাবনার উদ্ভবই হলো আইকনোক্লাস্ট রূপে, কিন্তু তাঁরা কখনও ভাবতে পারেন না, তাদের আইকনেরও এমন পরিণতি ঘটতে পারে।

সাম্প্রতিক ঘটনার সূচনা, ত্রিপুরায় জমানা বদলের পর, গণরোষে মহান লেনিনের মূর্তি সদর্প অবস্থান থেকে ভূমিসাৎ হওয়া। বামপন্থী রাজনীতিতে ক্ষমতা হাতে পেলে শ্রেণীঘৃণা ও গণরোষে মানুষকে পিটিয়ে মারার ঘটনা শুদ্ধাচার হতে পারে, কিন্তু মূর্তি নিয়ে টানাটানি করাটা খুবই গর্হিত। বিশেষ করে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের স্রষ্টা কমরেড লেনিনের মূর্তি হলে তো কথাই নেই। তাই কমিউনিস্ট জগতে যে শোকাহত রোষের বন্যা বয়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সাম্প্রতিক ত্রিপুরায় এই আইকনোক্লিজমের ঘটনার পর টিভিতে দেখি, বিজেপি এমপি সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী বলেছেন, লেনিন ছিলেন একজন টেররিস্ট, সুতরাং তাঁর মূর্তি ভাঙায় কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। তার উত্তরে একজন বামপন্থী বুদ্ধিমন্ত বলেন, স্বামী একটা পাগল। সুতরাং পাগলে কিবা বলে আর ছাগলে কিবা খায়। তবে এই স্বামীর পাগলামিতে করা মামলাতেই জয়ললিতা ও শশীকলা ধরাশায়ী এবং ইটালিয়ান গান্ধী ‘ন্যাশনাল হেরাল্ড’ কেসে আদালতের কাঠগড়ায়। তবে স্বামী যাই বলুন, প্রয়াত সিপিএম এমপি অমল দত্ত রাশিয়ান আরকাইভ থেকে তথ্য আহরণ করে একটি বইতে লেনিনের সন্ত্রাসী ভূমিকার মুখোশ উন্মোচন করেছেন

বিশদভাবে।

কমরেড লেনিন কোনও মূর্তির মাথা ভাঙেননি বটে, তবে জ্যান্ত লোকের মাথা ভাঙার নজির স্থাপন করেছেন। কোয়ালিশন সরকারে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত বলশেভিক মন্ত্রী ট্রটস্কি একটি সামরিক ক্যু করে কেরেনেস্কি সরকারের পতন ঘটানোর নামই হলো মহান অক্টোবর তথা নভেম্বর বিপ্লব। সেই সরকার বদলের পর স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলে, লেনিনের আদেশে জারকে নিরস্ত্র বন্দি অবস্থায় পরিবারসহ ফায়ারিং স্কোয়াডে মারা হয়। মূর্তি ভাঙার বদলে সেই একদা শাসককে কুকুরের মতো গুলি করে মারাটাই হয় লেনিনের প্রথম কীর্তি।

তারপর তো মূর্তি দূরের কথা, স্ট্যালিনের জমানায় বিপ্লবের সহযোদ্ধা ট্রটস্কি থেকে বুখারিন পর্যন্ত যাঁরা নেতৃত্বের পুরোধা পুরুষ ছিলেন, সকলকে প্রাণ হারাতে হয়। আর সাধারণভাবে তো লক্ষ কোটি মানুষের হত্যা ও কারাবাস ছিল নেহাত নিত্য ঘটনা। মহান সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে দেশে দেশে যে শ্রেণীঘৃণার সৃষ্টি হয় তার ফলে সোভিয়েত থেকে মুক্তির পর নেতাদের মূর্তি ধূলিসাৎ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্ব ইউরোপের বর্তমান ছায়াছবি ও লেখালেখিতে।

তবে পূর্ব ইউরোপের কথা বাদ দেওয়া গেল, খোদ রাশিয়াতেই মহান লেনিনের মূর্তি টলে যায়। সোভিয়েত জমানায় রাশিয়ার একদা রাজধানী যে সেন্ট পিটার্সবার্গকে লেনিনগ্রাদ আখ্যা দেওয়া হয়, সেটির কেন পুনর্মূষিক অবস্থা হলো কে জানে। তাছাড়া মূর্তি ভাঙার ঘটনাও বিরল নয়। আসলে মার্কসিস্ট দর্শন অনুযায়ী গণআন্দোলনে সমাজই মুখ্য, ব্যক্তির স্থান গৌণ। কিন্তু এই ভ্রান্ত দর্শনের বাস্তবে যেমন তার বিপরীত রূপ দেখা যায়, ব্যক্তিসম্পর্কেও ব্যবহার একই রকম। তাই কমিউনিস্ট জমানায় ব্যক্তিপূজায় এত প্রবল প্রতিপত্তি। দেখা যায় মহামানবের রূপ ধরে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-জে-দং-এর পুতুলের দেশজুড়ে এত ছড়াছড়ি। এমনকী কালীঠাকুরের কাছে বলি দেওয়ার মতো যত দানবকর্মের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় মৃত লেনিনের মমি। ঠিক মিশরের মৃত ফারাওদের মতো। সোভিয়েত জমানার পতনের পর লেনিন মমির সেই মহিমাও অন্তর্হিত।

পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দুদের না হয় ব্যারাম আছে যেখানে সেখানে শিবঠাকুর, শনিঠাকুর, কালীঠাকুরের মূর্তি গড়ে তোলা, কিন্তু মুক্তমনের সব আধুনিকতাবাদে কেন এত পুতুলপুজোর আয়োজন এবং যেখানে সেখানে নিজেদের দেবদানবের মূর্তি গড়ে তোলা, তা বোঝা ভার। প্রায় সত্তর বছর ধরে জগতের মুক্তিদাতারূপে লেনিনকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ধুম পড়ে যায় সোভিয়েত রাশিয়ার মদতে। কিন্তু একশো বছরের অনেক আগেই মার্কসবাদের বিভ্রান্তি ও তার অপব্যাখ্যা দিয়ে ত্রাসে, সন্ত্রাসে, মানুষকে শ্রমদাস ও ক্রীতদাস বানিয়ে যে মহান ইমারত গড়ে তোলার চেষ্টা হয়, তা আপন অন্তঃসারশূন্যতায় একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। প্রবল গণআন্দোলনের সোভিয়েত সাম্রাজ্যের কলোনি পূর্ব ইউরোপে তথা প্রাচ্যে মহান লেনিনিজম গেলানোর মিলিটারি আগ্রাসনের আপ্রাণ চেষ্টা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে লেনিনের মূর্তিও।

আসলে বাইরে থেকে দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন যেমন অনেক সময় জীবনদায়ী না হয়ে মৃত্যুর কারণ হয়, তেমনি, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগহীন কিছুকে জোর করে দেশের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিলেও তা-ও একদিন আক্রমণের শিকার হয়। দেশের মাটিতে উদ্ভাস্ত বিপ্লবের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় বাম জমানা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বামপন্থী বুজরুক লেনিনের মানস সন্তানেরা জোর করে মূর্তি স্থাপন করে কলকাতা ও ত্রিপুরায় লেনিনের মহিমা বিস্তারের চেষ্টা হয়। সেই লেনিনের ওপর দেশের লোকের এমনই শ্রদ্ধা উদ্গত হয় যে, এসপ্ল্যানেডে একদা সেটি ব্যাগ বিক্রির এক মহান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তার পর সোভিয়েত দূতাবাস থেকে তীব্র প্রতিবাদ সরকারকে জানানোর ফলে, সেটি পুলিশের দ্বারা পরিষ্কার করা হয়।

কমরেড লেনিন শত্রু দেশ জার্মানির সাহায্যেই হোক, আর দেশে মিলিটারি ক্যু করে হোক, ক্ষমতা দখল করেন। রাশিয়ায় যুগ পরিবর্তনের জন্য তাঁর এক মহান ভূমিকা থাকতে পারে। কিন্তু দেশে দেশে বিপ্লব রপ্তানি করে জগতের মুক্তিদাতারূপে আবির্ভূত হতে তিনি একেবারেই ব্যর্থ। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'— আহ্বান শোনা সত্ত্বেও দুনিয়া সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিকদের ক্রীতদাস ও শ্রমশিবিরের রাষ্ট্রদাস অবস্থা দেখেই বিশ্বজুড়ে সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে লোক ঠকিয়ে লেনিনকে মুক্তিদাতারূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাটা মোটেই কিন্তু সফল হলো না। খালি জগদ্দল পাথরের মতো মূর্তিটা বৃথাই হতমান হয়ে বিরাজিত।

অপ্রয়োজনীয় মূর্তি অপসারণ কিন্তু আমাদের দেশেই এক অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর বস্তু। ব্রিটিশ আমলে যে সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রহরীর মূর্তি কলকাতার রাস্তাঘাটে সদর্পে বিরাজ করত তারা আজ অপসারিত হয়ে ইতিহাসের ডাস্টবিনে অদৃশ্য অন্তরালে। অক্টারলনি সাহেবের যুদ্ধজয়ের স্মৃতিতে নির্মিত ময়দানে অক্টারলনি মনুমেন্ট যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভেলকিতে হয়ে গেল 'শহিদ মিনার'। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রানিমূর্তি স্বস্থান থেকে অন্তর্হিত। মেমোরিয়ালটি যে শেষ পর্যন্ত তাজমহলের মতো লালমহলে রূপান্তরিত হয়নি এই রক্ষে। তবে সেই মূর্তি অপসারণ হয়েছে, সরকারি সিদ্ধান্তে ও সরকারি তত্ত্বাবধানে। তাই সে কাজে অর্ধশিক্ষিত অতি উৎসাহীর ধ্বংস কর্মের কোনও স্থান নেই।

চেয়ারম্যান মাও-এর ভক্তিতে গদগদ অতিবামপন্থী বিপ্লবীর দল একদা বিদ্যাসাগরের মূর্তির মুণ্ডপাত করেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাওপন্থীরা অরাজনৈতিক উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনের জ্যান্ত দেহের মুক্তপাত করেছিল। এই মাও মদমত্ত নির্বোধ আততায়ীর দল মুখে 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান' বলে গলা ফাটালেও কার্যকালে কেউই ডেপুটি চেয়ারম্যান হতে পারেনি। সন্ত্রাস সৃষ্টিতে যে বিপ্লব হয় না, সমাজ পরিবর্তনের জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা এই মূর্খ পণ্ডিত মাওবাদীদের ঘটে স্থান পায় না। তাই বিপ্লবের নামে কানামাছি ভোঁ ভোঁ করাই তাদের সার হয়। বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাতে বিদ্যাসাগরকে জাতীয় জীবন তথা ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করা যায় না। বাংলার বুকে ইতিহাস পুরুষরূপে তাঁর অবস্থান কোনও অর্বাচীন

দুষ্কৃতীর দল নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।

ত্রিপুরায় লেনিন মূর্তির অপসারণের প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি কালিমালিপ্ত করার এক অতি উৎসাহী অদম্য রাগের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। এদের সঙ্গে নাকি যাদবপুরি বিপ্লবীচক্রের যোগ আছে। এটা অবশ্য একটা ছিঁচকে চুরির ঘটনার মতো। তবে এই মহাবিপ্লবী যাদবপুরি চক্র নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। কাশ্মীরের স্বাধীনতা বা নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা নিয়ে এই বিপ্লবী বুজরুকরা যতই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লেজ নাড়ুক আসল সংগ্রামের ক্ষেত্র কাশ্মীর বা নাগাল্যান্ডে তাদের টিকিটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা শ্যামাপ্রসাদের মুণ্ডপাত করতে পারে, কেননা শ্যামাপ্রসাদের সংগ্রাম ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে তাদের বামপন্থী বুজরুকি সম্ভব হতো না। পূর্ববঙ্গে তো কমিউনিস্ট পার্টির দুর্দশার একশেষ, আজ থেকে নয়, আর বামপন্থী পার্টিগুলো তো এখন হাসিনা সরকারে মনসবদার। সুতরাং যত বামপন্থী আস্ফালনের বিপ্লব সম্ভব শুধু এই বঙ্গের উর্বর ভূমিতে।

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে শুধু শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙার প্রয়াসই নয়, তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় নেতা রামস্বামী পেরিয়ারের মূর্তি ভাঙারও অপচেষ্টা হয়। তামিলনাড়ুর সংস্কার আন্দোলনের জনক রামস্বামী পেরিয়ার জাতপাত বিভক্ত অত্যন্ত কঠোর রক্ষণশীলতার দুর্গকে ধূলিসাৎ করে আধুনিক তামিলনাড়ুর অভ্যুদয়ের জনক হন। রক্ষণশীলতার কঠোর গড্ডলিকাপ্রবাহের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে তিনি সংস্কার আন্দোলনের ফলে তামিলনাড়ুতে নবজীবনের ফল্গুধারা আনয়ন করেন।

পেরিয়ারের জাস্টিস পার্টি থেকে উদ্ভূত আজকের দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম তামিলনাড়ুতে নবযুগের সৃষ্টি করে। তার জন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে একের পর এক সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ তুলে তিনি যে আধুনিক তামিলনাড়ুর জন্ম দেন সেটিই পরে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে স্বাধিকার রক্ষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করে। এই পেরিয়ারের মূর্তির অবস্থান, লোকের প্রেরণার উৎসস্বরূপ। কোনও অর্বাচীন বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী তাতে আঘাত করলে সেটা আত্মহননের শামিল হবে।

অনুরূপভাবে সংবাদে প্রকাশ, মীরাটে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতেও দুষ্কৃতীরা আঘাত করে নষ্ট করার চেষ্টা করে। অবহেলিত দলিতশ্রেণীর সন্তান, ভীমরাও আম্বেদকর স্বীয় প্রতিভাবলে দেশে-বিদেশে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দেশে ফিরে সর্বভারতীয় নেতায় পরিণত হন। নিজের উন্নতিতেই তাঁর কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ ছিল না। সারাজীবন তিনি চেষ্টা করেছেন বর্ণভেদের কুফল দূর করতে এবং দলিত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে। সেই ভেদাভেদহীন ভারত তৈরি করার উদ্দেশ্যেই স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় মনোনিয়োগ করেন। আম্বেদকরের মূর্তিকে আঘাত করা আসলে তাঁর সেই ভাবনার ভারতকে আঘাত করা।

সরকারের উচিত কঠোর হস্তে এইসব মূর্খের তাণ্ডবকে অবিলম্বে বন্ধ করা এবং দুষ্কৃতীদের কঠিন শাস্তিপ্রদান করা। তবেই এর মূলোচ্ছেদ সম্ভব।

ঠেকায় পড়ে মমতা এখন লেনিনপন্থী

ত্রিপুরায় বিজেপি জেতার কিছুদিন পর সানডে গার্ডিয়ানে একটা লেখা বেরিয়েছিল। বিজেপির ত্রিপুরাজয়ে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কর্মীরা কতটা দিশেহারা, সেটাই ছিল লেখার বিষয়। এর দু-একদিন পর লেনিনমূর্তি ভাঙা হলো। এবং তৃণমূল নেত্রী বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গে একটিও লেনিনমূর্তি ভাঙতে দেব না।' অথচ ২০১১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবার পরেই বিজয়গড়ে লেনিনমূর্তি ভাঙা হয়েছিল। সেই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিনা কিংবা গ্রেপ্তার করা হলেও তাদের কোনও শাস্তি হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। এরপর ২০১৫। সেবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক বিপরীতে লেনিনমূর্তিটি ভাঙা হয়। মূর্তির নাক এবং চিবুক সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল ওই এলাকার দুই স্বনামধন্য তৃণমূল কর্মী বাবুসোনা সরকার এবং অমিত সরকারের বিরুদ্ধে। পুলিশ প্রথমদিকে একটু নড়াচড়া করলেও পরে সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সিপিএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছে না। এই নিয়ে সিপিএম প্রতিবাদ মিছিলও বের করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি। এই সময়েই গড়বেতায় আর একটি লেনিনমূর্তি ভাঙে দুষ্কৃতীরা। সেক্ষেত্রেও অভিযোগের তির ছিল স্থানীয় তৃণমূলকর্মীদের দিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতানুগতিক নিন্দা করে দায় সেরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুধু লেনিনই নন, মমতা-অনুগামীদের হাত থেকে রেহাই পাননি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও। তাঁর মূর্তি ভাঙা হয় হাওড়ায়। রাজারহাটের নাম জ্যোতি বসু নগর করা নিয়ে বিরোধ চলছিলই। সেই বিরোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মূর্তি ভাঙার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে অন্য ছবি। মমতা প্রকাশ্যেই বামপন্থীদের বরাভয় দিচ্ছেন। কারণ সিপিএম -কংগ্রেস ইত্যাদি ঘটিবাটি সাজিয়ে তৃণমূল বিরোধী ভোট কাটাতে না পারলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির ভালো ফল করার সম্ভাবনা। তাই তিনি লেনিনকে বাঁচিয়ে সিপিএমকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা নিন্দনীয় হবে না কেন?

অমলেশ মিশ্র

২০১৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এমন দুটি ঘটনা ঘটল, যা আমাদের প্রায় ৫০ বছরের পুরানো ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিল। এই ৫০ বছরে আমরা ওই ঘটনাগুলির কথা বিস্মৃতই হয়েছিলাম। নতুন প্রজন্ম হয়তো সেই ঘটনাগুলির কথা আদৌ শোনেনি। আসছি সে কথায়।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল জানা গেল ৪ মার্চ ২০১৮। বিধানসভার মোট ৬০টি আসনের মধ্যে ৪৩টি আসনে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি এবং জোটসঙ্গী আই পি এফ টি। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভোট পেয়েছে ৫০ শতাংশ। পাঁচ বছর আগে ছিল ২ শতাংশ। অর্থাৎ ভোট বাড়িয়েছে ৪৮ শতাংশ। এটি বিগত ৭০ বছরে ভারতের রাজনৈতিক নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এমন ঘটনা বিগত ৭০ বছরে কোথাও ঘটেনি। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এক দলের দীর্ঘকালীন শাসন পরিবর্তনের ঘটনার কোনও সমতুল্য নজির নাই। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের (২০১৮) এই ফলাফল তাবৎ রাজনৈতিক দলগুলির সকল প্রকার শক্তি ও সঙ্গতির বহু ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামশাসন ব্যবস্থাকে পরাজিত করে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতা দখল একটি উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সাফল্যের ঘটনা। এটি উল্লেখযোগ্য বটে, তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নয়। 'সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য' বিশেষণটি কেবলমাত্র ত্রিপুরার ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্য হলো— (১) যারা এবার ক্ষমতায় এল, ৫ বছর আগের বিধানসভা নির্বাচনে তারা কোনও উল্লেখযোগ্য শতাংশ ভোটও পায়নি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে দেখা যেত। (২) মতাদর্শগত পার্থক্যটিকে বিবেচনায় আনতে হবেই। সিপিআই (এম) ও বিজেপি আদর্শগত ভাবে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। সেই বিপরীত মতাদর্শ পরাজিত হয়েছে। (৩) এই পরিবর্তনটি ঠিক তখনই হলো যখন ভারতের বিজেপি-বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মানিক সরকারের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই। মানুষ হিসেবেও তিনি উন্নতমানের। অপরদিকে বিজেপির নেতা ছিলেন অপেক্ষাকৃত ভাবে কম পরিচিত। তার দলও ছিল অতি নগণ্য অবস্থায়। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সালে বিধানসভার আগে যথেষ্ট ভালো অবস্থায় ছিল। ত্রিপুরায় কোনও সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম ছিল না যে বিজেপি ফয়দা তুলেছে।

বিজেপির নির্ভেজাল ভারতীয় মানসিকতা এবং তার উত্থান ও নির্বাচনে প্রভাব, বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা দিয়েছে। দুই পক্ষের মতাদর্শ, ভাবধারা, মানসিকতা, দেশ পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। এই কারণেই বিজেপির প্রাজ্ঞ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী অনেকদিন আগেই দেশের মানুষকে শুনিয়েছিলেন— বিজেপি ইজ এ পার্টি উইথ এ ডিফারেন্স— বিজেপি অন্যান্য দলের থেকে একটি পৃথক দল। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির যে বিশাল উত্থান ২০১৪ সাল থেকে আজ চার বছর আমরা দেখছি তা ভারতের ছোট বা বড় কোনও রাজনৈতিক দল হজম করতে পারছে না। তাই কংগ্রেস, বামদলগুলি, তৃণমূল কংগ্রেস, বসপা, সপা, আরজেডি, শিবসেনা, টিডিপি সবাই একটি 'গেল গেল সব গেল' ভাবের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টায় রয়েছে। তারা মনে করত মুসলমান ভোটাররা তাদের সংরক্ষিত শক্তি এবং সেই শক্তি অবশ্যই বিজেপি বিরোধী। এখন তারা প্রত্যক্ষ করছে যে, মুসলমান ভোটাররাও বিজেপিকে অচ্ছুত মনে করছে না। 'সব গেল, সব গেল' রবটা এখন একটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক আবহাওয়া এরকম ছিল না।

এদেশে দুর্গা, কালী, সরস্বতী বা হিন্দু সংস্কৃতির অন্য কোনও প্রতিমূর্তি যখন ভাঙা হয় তখন তো এত কলরব শোনা যায় না, শোনা যায় না কোনও নিন্দাবাদ। লেনিন, স্ট্যালিন, বিদ্যাসাগর, বুদ্ধ, শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙা যদি নিন্দনীয় হয় তবে দুর্গা, কালী, শিব, সরস্বতীর মূর্তি ভাঙা নিন্দনীয় নয় কেন?

এই ধরনের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির অস্বাভাবিক প্রতিপত্তিকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সাফল্যের গৌরব এনে দিয়েছে। এই জয়ের প্রসঙ্গে সংবাদপত্রগুলির 'এ আর এমন কী' ভাবটাও বেশ নজরে পড়ে।

এই রকম একটি পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় দুটি জায়গায় কমিউনিস্ট মতবাদের গুরুদেব ভি আই লেনিনের মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে কেওড়াতলা শ্মশানে স্থিত ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক দল এ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। সব দলই এই ঘটনাগুলির নিন্দা করেছে।

লেনিনের রাজনৈতিক দর্শন এবং শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক দর্শন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। লেনিন বামেদের গুরুদেব। শ্যামাপ্রসাদ বিজেপির শ্রদ্ধেয়। লেনিন বলেছেন--- দুনিয়ার মজদুর এক হও। শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন— ভারতীয় সংস্কৃতির লোকেরা এক হও। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ অনুমান এই রকমই দাঁড়ায় যে, ত্রিপুরায় দীর্ঘকালীন বাম শাসনের পরাজয় মানে লেনিন

তথা বিদেশি সংস্কৃতির পরাজয়। লেনিনের মূর্তি তার প্রতীক, অতএব লেনিনের মূর্তি ভেঙে দাও। আবার সাধারণের এই অনুমান স্বাভাবিক যে, শ্যামাপ্রসাদের অনুগামীরা যদি লেনিন মূর্তি ভাঙতে পারে, আমরা শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙতে পারি না? অতএব এসো ভাঙো, অর্থাৎ বদলা।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা কেউই জানি না যে মূর্তিগুলি যারা ভেঙেছে তারা লেনিনের শিষ্য বা শ্যামাপ্রসাদের অনুগামী অথবা কোনও কুটিল, দুষ্টচক্র ঘোলাজল তৈরি করছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে যখন ব্যাপক নকশাল আন্দোলন চলছিল, তখন কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। অন্যান্য জায়গাতেও মহাপুরুষদের মূর্তি ভাঙা হয়েছে নকশালি উদ্যোগে। কেন তারা মূর্তি ভেঙেছে তার একটা ব্যাখ্যাও তারা দিয়েছিল। তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল তাদের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর মতোই প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাছাড়াও, তারা ছিল অর্বাচীন— পরের কথায় চলত। বলত— চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান।

মজার কথা হলো, আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিদ্বজ্জনেরা এতটাই রাজনীতি সচেতন যে তারা সংস্কৃতি- চেতনাটা হয় হারিয়ে ফেলেছেন, না হয় উচ্ছিষ্ট লোভে পকেটে লুকিয়েছেন। প্রমাণ পাওয়া যায় তখন, যখন ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির উপর কোনও আঘাত আসে। ভারতীয় সংস্কৃতির কোনও মূর্তি ভাঙা হয়, এদের মুখে 'রা' শোনা যায় না। অথচ লেনিনের মূর্তি ভাঙলে এদের চিৎকারে কাক চিল শকুন বসতে পায় না। এদের বৌদ্ধিক অগ্রগতি বিপজ্জনক আর মানসিক অবনতি বিস্ময়কর।

মূর্তি ভাঙা একটি আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি প্রতীক বা সিম্বল। বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে তা করতে না পারার যে ব্যর্থতাজনিত আক্ষেপ ও হতাশা অথবা বিপক্ষকে চরম পর্যুদস্ত করার যে আনন্দ, এই দুই মনোভাবের যে কোনওটি থেকেই মূর্তি ভাঙার প্রবণতা আসতে পারে। দুটি মনোভাবের কোনওটিই স্বাস্থ্যকর নয় আবার অস্বাভাবিকও নয়। নকশালপন্থীরা বা তালিবানেরা যখন মূর্তি ভাঙে তখন বোঝা যায়— এটি আক্রোশ ও প্রতিহিংসার কাজ। আমার মতের বিরুদ্ধ কোনও মতকে আমি

বীরভূমের ময়ূরেশ্বর: জেহাদিদের তাণ্ডব, বিধ্বস্ত বজরংবলি মন্দির।

অতি-বামেদের হাতে বিধ্বস্ত কেওড়াতলার শ্যামাপ্রসাদ মূর্তি।

থাকতে দেব না— ভেঙে দেব, গুঁড়িয়ে দেব। সেটা বাস্তবে করতে পারছি না— মূর্তি ভেঙে তার ক্যাথারসিস্ করছি।

মানিক সরকার ভালো মানুষ। কিন্তু সর্বভারতীয় সিপিআই (এম)-এর চেহারাটা আদৌ সম্মান বা সমীহজনক নয়। সর্বভারতীয় সম্পাদক সেই পঞ্জাবি শিখ ভদ্রলোকের (হরকিষেন সিংহ সুরজিৎ) সময় থেকেই দলটি একটি রাজনৈতিক দালাল রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই এত বছরে একটিমাত্র অ্যাজেন্ডায় তারা চিহ্নিত যে, তারা শত ভাগ হিন্দু ও হিন্দু-সংস্কৃতি বিরোধী। ওদের সব অবস্থান এদিক ওদিক হলেও, হিন্দু ও হিন্দুত্ব বিরোধিতায় অটল। এটা ওরা বুঝতে চায় না যে, ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু বিরোধিতা কার্যকর নয়।

পুরানো মানুষদের ত্রিপুরার সন্তোষমোহন দেবের কথা মনে আছে। তার উদ্যোগে সুধীর মজুমদারকে মুখ্যমন্ত্রী করে ত্রিপুরায় কংগ্রেস শাসন লাগু হয়েছিল। কিন্তু তাদের কুকর্মই সিপিএমকে সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে ত্রিপুরার মানুষের মনে সিপিএম এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা তৈরি হয়েছিল, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তা প্রকাশিত হওয়ায় সুযোগ পেল ২০১৮-র বিধানসভা নির্বাচনে।

একাজে বিজেপি দুটি উল্লেখযোগ্য কৌশল নিয়েছিল। (১) বিরোধী ভোটকে ঐক্যবদ্ধ রাখা। তৃণমূল সেই কৌশলকে ভাঙতে আসরে নেমেছিল বটে, তবে সব আসনে জামানত খুইয়ে তারা তার মূল্য দিয়েছে। (২) দিল্লির বা সর্বভারতীয় বিজেপি এই নির্বাচনকে কেবলমাত্র ত্রিপুরার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। তাকে একটি সর্বভারতীয় ইস্যু করে তুলেছিল। কংগ্রেস, সিপিআই (এম) বা অন্য কোনও দলের সাধ্য ছিল না বা নেই যে কোনও রাজ্যের কোনও ইস্যুকে তারা সর্বভারতীয় রূপ দিতে পারে। একমাত্র হিন্দু বিরোধিতার ক্ষেত্রেই তারা একটি সর্বভারতীয় প্ল্যাটফর্ম আগে তৈরি করতে পারত, এখন আর পারে না। কারণ সারা ভারতে ২২টি রাজ্যে বিজেপি শাসন চালু হয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে, এহেন প্রচেষ্টায় একটি দল যখন শূন্য থেকে ১০০ পেয়ে যায় তখন কোনও কোনও সমর্থক কোনও অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। তবে একথা আমি বলছি না যে ত্রিপুরায় লেনিন মূর্তি এবং পশ্চিমবাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মূর্তি যথাক্রমে বিজেপি ও সিপিএম সমর্থকরা ভঙ্গ করেছেন। একথা নির্দ্বিধায় বলবার জন্য যে প্রমাণ প্রয়োজন তা আমার কাছে নেই। আমি একটি অনুমানের কথা বলছি মাত্র।

প্রশ্ন হলো, এদেশে দুর্গা, কালী, সরস্বতী বা হিন্দু সংস্কৃতির অন্য কোনও প্রতিমূর্তি যখন ভাঙা হয় তখন তো এত কলরব শোনা যায় না, শোনা যায় না কোনও নিন্দাবাদ। লেনিন, স্ট্যালিন, বিদ্যাসাগর, বুদ্ধ, শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙা যদি নিন্দনীয় হয় তবে দুর্গা, কালী, শিব, সরস্বতীর মূর্তি ভাঙা নিন্দনীয় নয় কেন? যদি নিন্দনীয় হয় তবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তথাকথিত বিদ্বজ্জন ও সংবাদমাধ্যমগুলি এক মহান ঐশ্বরিক নির্লিপ্ততায় তা কেবলমাত্র অবলোকন করেন কেন? কেন কোনও নিন্দাসূচক ধ্বনিও গুঞ্জরিত হয় না? সুলতান মামুদ থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ৭০০ বছরে ভারতে মন্দির আর মূর্তি ভাঙার হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে।

ভারতবর্ষের পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকগুলিতে সেগুলির কোনও উল্লেখ নেই, নেই কোনও নিন্দাবাদ। তাই-ই বা কেন? ■

এই সময়

সারমেয় সংবাদ

এই সপ্তাহটি কুকুরদের খুব একটা ভালো যায়নি। বিশেষ করে যেসব কুকুর বিমানে

যাতায়াত করতে অভ্যস্ত। সপ্তাহের গোড়াতেই ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বিমানে পপি শ্রেণীর একটি কুকুর মারা যায়। এর ঠিক দু'দিন পর ফ্রান্সের কুকুর ভুল করে চলে গেল জাপানে। এবারও অপরাধী সেই ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স।

ওবামার টেবিল

বারাক ওবামা তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ২০১৬-র মে মাসে তিনি ভিয়েতনামের একটি রেস্তোরাঁয় ডিনার করেছিলেন। রেস্তোরাঁ

মালিক সেকথা ভোলেননি। সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন ওবামার খাওয়ার ছবি। সম্প্রতি যে-টেবিলে ওবামা ডিনার করেছিলেন তাও সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিরক্তি

পাশেই এক সাংবাদিক চল্লিশ সেকেন্ড ধরে দীর্ঘ

এক প্রশ্ন করে চলেছেন। বিরক্তি গোপন করতে পারেননি লিয়াং জিয়াংই নামের অন্য এক চীনা সাংবাদিক। তাঁর তির্যক দৃষ্টি ইতিমধ্যেই ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে ঘটনাটি ঘটেছে।

সমাবেশ -সমাচার

ছত্তিশগড়ে গোরক্ষা আন্দোলন সমিতির জাতীয় অধিবেশন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গোরক্ষা শাখার, ভারতীয় গোবংশ রক্ষা সংবর্ধন পরিষদ, গোহত্যা এবং মাংস নির্যাত নিরোধ পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় গোরক্ষা আন্দোলন সমিতির অখিল ভারতীয় বৈঠক গত ২৩,২৪,২৫ ফেব্রুয়ারি ছত্রিশগড়ের ভিলাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে মূলত সাংগঠনিক বিষয়ের ওপর প্রান্ত, বিভাগ, জেলা ও প্রখণ্ড স্তর পর্যন্ত বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। গোরক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে সারা বছরে যেসব পর্ব পালনের কথা বলা হয়েছে তা হলো— (১) মকর সংক্রান্তি, (২) মহা শিবরাত্রি, (৩) শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, (৪) বলরাম জয়ন্তী, (৫) রক্ষা বন্ধন, (৬) গোবৎসা দশমী, (৭) গোবর্ধন পূজা, (৮) মহাগোপাষ্টমী।

গোরক্ষা বিভাগের কেন্দ্রীয় সমস্ত কার্যকর্তার উপস্থিতিতে সুষ্ঠু ভাবে অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে যারা বিষয় প্রতিপাদন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ক্ষেমচাঁদ শর্মা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ হুকুমচাঁদজী সাওলা, রাজেন্দ্র সিংঘল, সুনীল বালকৃষ্ণজী মানসিংকা, নরেন্দ্র ভাই প্যাটেল, উমেশচন্দ্রজী শেরওয়াল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্তর্রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া। অধিবেশনে দক্ষিণবঙ্গ থেকে ১৫ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের নেতৃত্ব দেন অঞ্জন কুমার বিশ্বাস।

আর্টিস্টস্ অব ইন্ডিয়ার সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা

আর্টিস্টস্ অব ইন্ডিয়া তাদের নতুন ওয়েবপেজের মাধ্যমে গত ২৬ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য নতুন প্রজন্মের কাছে শিল্পের মাধ্যমে দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরা। বিভিন্ন শিল্পের আঙ্গিকে দেশাত্মবোধক ভাবনা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার প্রকাশ পাওয়া যায় দেশ ও বিদেশ থেকে আসা বিভিন্ন অঙ্কন, গান, নাচ, ছবি ও বক্তৃতায়। এই প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে ওয়েবসাইটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেক স্বনামধন্য শিল্পী ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সঙ্গীত ও সাহিত্য জগতের কয়েকজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ওয়েবসাইটের কর্ণধার ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী, শ্রীমতী সুমিতা বসু ও তন্ময় সেনগুপ্ত বলেন, ভারতীয় জনমানসে বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে দেশের প্রতি প্রেম, গর্ববোধ, ভালোবাসা, ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করার জন্য তাদের এই প্রয়াস। গণতন্ত্র দিবসে 'ভারতমাতা' থিমের ওপর যে বিপুল সাড়া তারা পেয়েছেন দেশ ও বিদেশ থেকে, তাতে তাঁদের বিশ্বাস শিল্পের মাধ্যমে দেশকে জানা ও ভালোবাসার এই প্রয়াসে সমগ্র ভারতবাসীর আশীর্বাদ ও সহযোগিতা তাঁরা পাবেন।

এই সময়

ডাইনোসরের উত্তরসূরি

পাখিরাই ডাইনোসরের উত্তরসূরি। এ কথার ইঙ্গিত প্রথম দিয়েছিলেন জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ

ক্রিস্টিয়ান ভন ময়ার। ১৫০ লক্ষ বছরের পুরনো একটি ফসিল দেখে মনে হয়েছিল সেটা অতিকায় পাখির ফসিল। নাম দিয়েছিলেন আর্কিওপটেরিক্স। পরে জানা যায় আর্কিওপটেরিক্স ডাইনোসরের পরিবর্তিত রূপ।

কর্ণাটকে

কর্ণাটকের ৫৭ জন বীরশৈব সন্ন্যাসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার কাছে লিঙ্গায়েতদের বিশেষ

ধর্মীয় মর্যাদা দেবার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গড়া কমিটির সুপারিশ মানা চলবে না।

মুম্বাইয়ে ভিনটেজ

মুম্বাইয়ে ভিনটেজ (পুরনো) গাড়ির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এই নিয়ে সারা শহরে উৎসাহের

শেষ নেই। প্রদর্শনীতে থাকবে ২৭টি গাড়ি এবং ১২টি মোটর সাইকেল। টিকিটের দাম বড়োদের জন্য ৫০ টাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০ টাকা।

সমাবেশ -সমাচার

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শ্রদ্ধার্ঘ্য বর্গ

গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সরস্বতী শিশু মন্দিরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি দু' দিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য বর্গে অনুষ্ঠিত হয়। নদীয়া জেলার দশটি স্থান থেকে বর্গে ৪৫ জন সেবিকা অংশগ্রহণ করেন। বর্গে

উপস্থিত ছিলেন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী। নিবেদিতার ত্যাগ, সেবা ও স্বদেশে চেতনার আদর্শে আজকের ভারতের হিন্দু মহিলাদের ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল এই বর্গের প্রধান উদ্দেশ্য।

চাঁচলে অর্শ চিকিৎসা শিবির

প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তর মালদার চাঁচল মহকুমার বিভিন্ন এলাকার গরিব দুঃস্থ মানুষের কথা ভেবে সেবা ভারতী উত্তর মালদা ট্রাস্টের উদ্যোগে এক অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয় চাঁচল মাড়োয়ারি ধর্মশালায়। চিকিৎসক হিসেবে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্শ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি বি সাহা। সেবাভারতীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী ও

ষষ্ঠী শর্মা বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ গ্রামবিকাশ প্রমুখ গৌতম মণ্ডল। শিবিরে সামসী, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল এলাকার ৮০ জন অর্শরোগীর চিকিৎসা করা হয়।

স্বদেশী রিসার্চ ইন্সটিটিউটের আলোচনা সভা

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী হলে স্বদেশী রিসার্চ ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ২০১৮-১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জয়ন্ত সিন্‌হা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সমীর ব্রহ্মচারী। বিশেষ

এই সময়

শশীকলার ভাইপো

পিসি জেলে। কিন্তু তাতে কী! এবার শশীকলার ভাইপো টিটিভি দীনকরন একাই

মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে এক নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে। নাম আম্মা মাক্কাল মুন্নেত্রা কাজাগ্রাম। নতুন দলের পতাকায় থাকবে জয়ললিতার ছবি।

সাইনবোর্ডে ওড়িয়া

ওড়িশায় সাইনবোর্ডে ওড়িয়া ভাষায় সংস্থার নাম লেখা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার।

সম্প্রতি ওড়িশা সরকার ওড়িশা শপস অ্যান্ড কমার্শিয়াল এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৫৬-তে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

ইঞ্জিন শতবর্ষে

ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি চিরকাল বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে।

কিন্তু একটি রেলইঞ্জিন কোনওদিন পর্যটকদের আকর্ষণ করবে এরকম কখনও ভাবা যায়নি। সিমলার একটি শতবর্ষ প্রাচীন ইঞ্জিন সেই অভাবনীয় কাণ্ডই ঘটিয়েছে। ইঞ্জিন দেখতে দলে দলে আসছেন পর্যটকেরা।

সমাবেশ -সমাচার

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এছাড়া স্বদেশী রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রধান ধনপতরাম আগরওয়াল, রাজেন্দ্র কুমার ব্যাস ও বিধুশেখর শাস্ত্রী মঞ্চাসীন ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে ধনপতরাম আগরওয়াল বাজেটের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বিগত বছরগুলিতে ভারতীয় অর্থনীতি যে বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে সে কথাও তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি তথাগত রায় তাঁর বক্তব্যে নয়ের দশকের আগে পর্যন্ত দেশে চলা মিশ্র অর্থনীতির ব্যর্থতা তুলে ধরেন। জয়ন্ত সিনহা তাঁর ভাষণে স্বদেশীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, স্বদেশীর অর্থ হলো ভারতে স্বদেশী পদ্ধতিতে উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ানো। অনুষ্ঠানান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজেন্দ্র কুমার ব্যাস।

ভোঁওরলাল মল্লাবত সেবাকেন্দ্রের হোলি প্রীতি সম্মেলন

গত ৬ মার্চ ভোঁওরলাল মল্লাবত সেবাকেন্দ্রের হোলি উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সংস্থার ৪২, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের কার্যালয়ে। সম্মেলনে ডাঃ সুনিতা রাঠী সবাইকে আবিরের তিলক পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান। ডাঃ বিজয় হরভজনকা, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, রামগোপাল সুংঘা, ডাঃ শরদচন্দ্র মন্ত্রী প্রমুখ সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সবাইকে হোলির শুভেচ্ছা জানান। সম্মেলনে মাতা-ভগিনীরাও উপস্থিত ছিলেন।

নদীয়া জেলা সংস্কৃত সম্মেলন

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলা সংস্কৃত সম্মেলন সমিতির পরিচালনায় কৃষ্ণনগর পৌরসভার 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মঞ্চে' অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলা সংস্কৃত সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অবনীমোহন জোয়ারদার, সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক

প্রণব নন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিনিধি অসীম প্রামাণিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। সম্মেলনের শুভ সূচনা হয় একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে। সংস্কৃত ভাষার সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের উদ্দেশ্যে দুশো সংস্কৃতপ্রেমী শোভাযাত্রার পর অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রায় সংস্কৃত ভাষায় নাটক, গান এবং ভাষণের আয়োজন করা হয়।

কংগ্রেসের হিন্দুত্ব কৌশল
আর একটি রাজনৈতিক ভুল

অতিথি কলম

সদানন্দ ধুমে

কংগ্রেস দল কি ভারতকে শাসন করার পক্ষে উপযুক্ত হিন্দু দল? সম্ভবত এমন একটা প্রশ্ন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রবল টালবাহানা চলছে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে, কেননা আগামী বছরেই মহা গুরুত্বের নির্বাচনে বিজেপির মোকাবিলা সমাসন্ন।

নেহরু ঘরানার ধর্মনিরপেক্ষী ভাবের ওপর স্নো-পাউডার চড়াবার মতো ধর্মীয় চেতনা জেগে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রথম উদাহরণ হিসেবে গত বছরের গুজরাট নির্বাচনের প্রাক্কালে রাহুল গান্ধীর হঠাৎ মন্দিরে মন্দিরে ঢুঁ মারা শুরু হয়। মোটামুটি খান বারো মন্দিরে মাথা খুঁড়ে মাস দেড়েক সময় নিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁর বংশ কুণ্ডলী অনুযায়ী তিনি যে একজন পৈতেধারী ব্রাহ্মণবংশীয় তাও প্রকাশ্যে আনেন। একই সঙ্গে তিনি যে শিবভক্ত একথাও দেশবাসী জানতে পারে। তাঁর তল্পিবাহকরা আবার শুধুমাত্র হেঁজিপেঁজি হিন্দুর বদলে তাঁর কূল মর্যাদাকে বিশেষ মান্যতা দিতে তাঁকে দ্বিজোত্তম উপবীত ধারণকারী সেরা প্রজাতি বলে ঢালাও প্রচার দেন।

অতি সম্প্রতি কর্ণাটকে গিয়ে রাহুল গান্ধী আবার বলেছেন কংগ্রেসের মূল আদর্শ হলো দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মানো হিন্দু দার্শনিক বাসব আন্না। কংগ্রেস বাসব আন্নার অনুসারী। এই দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারককে কর্ণাটকের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কর্ণাটকেও আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে রাহুল গান্ধীর বহু মন্দির দর্শন যে অবশ্যম্ভাবী তা আর বলে দিতে হবে না।

রাহুল গান্ধীর এই হঠাৎ যাত্রার পর্যালোচনা করতে গেলে এক দশক পিছিয়ে ২০০৬ সালে তাঁকে করা একটি প্রশ্ন ও উত্তর প্রণিধানযোগ্য। তাঁকে নিজ ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন তাঁর ধর্ম 'জাতীয় পতাকা'। মাত্র ১২ বছর আগে তিনি তাঁর ধর্মীয় পরিচয় তুচ্ছ করেছিলেন আজ সেটিকেই তিনি বুকে বেঁধে ঘুরছেন। শুধুমাত্র পরিবারতন্ত্রের ধারক-বাহক হিসেবে রাহুল যে একাই এইসব করছেন তা নয়, অতি সম্প্রতি কংগ্রেসি মুখপাত্ররা, অনেকেই তাঁদের টুইট শুরু করার আগে 'বন্দে মাতরম্' লিখছেন। এদিকে কংগ্রেসি সাংসদ শশী থারুর বই লিখছেন 'Why I am a Hindu'। বইটি হিন্দু ধর্মের গুণকীর্তনে ভরপুর।

তবে, কংগ্রেসকে দোষও দেওয়া যায় না। গত ৭০ বছরের মধ্যে তারা যে গভীরতম সমস্যাক্রান্ত তা থেকে বের হতে সব রকম কৌশলই তাদের খুঁজতে হচ্ছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো কয়েক প্রজন্মের ব্যবধানে উঠে আসা বিপুল প্রভাবশালী একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, যিনি সমসাময়িক রাজনীতির ধারটাকেই আগাপাশতলা বদলে দিয়েছেন। ২০১৪ সালে জাতি ও শ্রেণীর সমস্ত তথাকথিত সমীকরণ ভেঙে চার পঞ্চমাংশ হিন্দুকে যারা নিজেদের হিন্দু বলে বিশ্বাস করে তাদের সংহত করেছিলেন এই নরেন্দ্র মোদীই।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ওই নির্বাচনে কেবলমাত্র মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ভোটের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিজেপিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এই কথাটা বলতে খুব বড় রাজনৈতিক পণ্ডিত হতে হয় না যে, বিপুল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশে কোন দলই কখনও চাইতে পারে না যে তাদের মুসলমান তোষণকারী বা মুসলমানদের দল বলে চিহ্নিত করা হোক।

তাই একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় খুব সহজ পন্থা নিয়েছে কংগ্রেস। (১) আমরাও মন্দিরে যাই, কিন্তু গরিব মুসলমানদের জীবিকা নিয়ে টানাটানি করে তাদের ব্যবসায় তালা লাগাই না। (২) আমরা তাজমহলের ভারতীয়ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলি না। (৩) আমরা সারাদিন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভারতের অন্য ধর্মাবলম্বীদের গালিগালাজ করার জন্য লোক

"নেহরু ঘরানার ধর্মনিরপেক্ষী ভাবের ওপর স্নো-পাউডার চড়াবার মতো ধর্মীয় চেতনা জেগে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রথম উদাহরণ হিসেবে গত বছরের গুজরাট নির্বাচনের প্রাক্কালে রাহুল গান্ধীর হঠাৎ মন্দিরে মন্দিরে ঢুঁ মারা শুরু হয়। মোটামুটি খান বারো মন্দিরে মাথা খুঁড়ে মাস দেড়েক সময় নিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন।"

ভাড়া করি না। থারুর তাঁর বইতে লিখছেন, হিন্দু দার্শনিকরা একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মের সারাৎসারকে কী সূক্ষ্মতায় অন্তরে উপলব্ধি করার বিষয় বলে তার পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আর এস এস-বিজেপির লোকেরা তাকে নিতান্তই সহজলভ্য রাজনৈতিক পরিচয় হিসেবে বহন ও মাধ্যম করে রাজনীতি করছে। তিনি আরও এগিয়ে আধা-অক্ষরজ্ঞান বিশিষ্ট হিন্দু জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী লড়াকু সৈনিকদের ব্রিটিশ ফুটবল ফ্যানদের উন্মাদ ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই এই পরিবর্তন দেখে কংগ্রেদের মধ্যে অনেকেই এটিকে সদর্থক বলে মনে করছেন। তাঁরা আশাবাদী যে, এ পথে আলো দেখা যেতে পারে।

মোদীর আওতা থেকে যদি তাঁর পেটেন্ট ওই 'হিন্দু-হিন্দু বস্তুটা' একবার কিছুটা হলেও আমাদের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মতে, আমরা মোদীকে তাঁর অর্থনৈতিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গে তিনি যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি পালন করতে না পারার বিষয়ে চেপে ধরতে পারি। অন্য সব মানদণ্ডে দু'টি দলে যদি উনিশ বিশ হয়, তাহলে এই একটি বিষয় কেন বাদ থাকবে। এটি আনলেই তো তথাকথিত ইনক্লুসিভ ব্যাপারটা হবে। এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আমার একটু মতপার্থক্য আছে। আমার মনে হচ্ছে কংগ্রেস রোগ নির্ণয়ে একটু ভুল করার ঝুঁকি নিয়ে ফেলছে। কেন বলছি— আমার অন্তত এখনও এমন কোনও বিজেপি সমর্থকের সঙ্গে দেখা হয়নি যাকে বলতে শুনেছি কংগ্রেসি নেতারা সেরকম পুজো, প্রার্থনা করে না তাই ওদের তেমন পছন্দ করি না। বরং তারা এটাই বার বার বলেছে যে কংগ্রেস ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যে ভালো আচরণ করে তা হিন্দুর সঙ্গে করে না। শুধু তাই নয়, মৌলবাদী ইসলামিয়-সন্ত্রাসবাদের বিপদ সম্পর্কেও কংগ্রেসি নেতারা যেন বিস্মৃত থাকেন।

অবশ্যই এই দুটি প্রসঙ্গই তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু এর মাধ্যমে যে সমস্যা উঠে আসে তা কিন্তু রাহুল গান্ধীর মন্দির দর্শন বা টিভি ক্যামেরায় তাঁর রুদ্রাক্ষের মালা কতটা দেখা গেল তার মাধ্যমে সমাধান হবার নয়। এই 'লোক দেখানোর জন্য করার' অপবাদ ঘোচাতে গেলে কংগ্রেসকে কিন্তু দেশব্যাপী বহুচর্চিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে দোলাচলচিত্ততা ঝেড়ে ফেলতে হবে। এটিকে লাগু করার ব্যাপারে দ্বিধা চলবে না। নজরে পড়ার মতো কুশ্রী বৈপরীত্যও একেবারে পরিত্যজ্য। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে দলের প্রাচীনতম উকিল সদস্য 'আসমানি কিতাব' প্রদত্ত শরিয়া আইনের যথার্থতা নিয়ে লড়ে যাবেন, যেমন সলমন খুরশিদ এই কাগজের এই স্তম্ভে কিছুদিন আগেই লিখেছেন। তিন তালাকের সপক্ষে কংগ্রেসের এক উকিল বিবাদী পক্ষের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রেও দলকে সমঝে বার্তা দিতে হবে, যেটা হয়তো খুব সহজ নয়। আজ মিডিয়ার বড় একটা অংশ বিজেপি'র কাজকর্মকে সমর্থন করায় দেশের আইনের শাসনের রক্ষক বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সমব্যথী হয়ে সমর্থন করাটা কেউই ভালোভাবে তুলে ধরবে না বা বরাবরের মতো প্রশ্রয় দেবে না। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল ২০১২ সালে। যখন সলমন খুরশিদ কাগজকে জানালেন বাটলা হাউস এনকাউন্টারে ২০০৮ সালে জঙ্গিরা একজন বহু বীরপদকে ভূষিত সেনা অফিসারকে খুন করার পর তাদেরও সংঘর্ষে নিহত হওয়ায় ঘটনাটি সোনিয়া গান্ধীকে জানাতে শ্রীমতী গান্ধী সেনা অফিসারের জন্য নয়, জঙ্গিদের জন্য অশ্রুমোচন করেছিলেন।

তবু বলব, এতসব খোলনলচে ঝেড়ে ফেলেও কংগ্রেস যদি চেষ্টা করে সেটাও হয়তো যথেষ্ট নয়। যে কোনওভাবেই ধর্ম, ধার্মিকতা, অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বরভক্তি, দেশপ্রেম এসব নিয়ে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হলে তা হবে বিজেপির সুবিধের জায়গা। বিজেপির কঠিনতম সমালোচকও কখনও সন্দেহ করেন না যে, এখানে সর্বস্তরে বিপুল ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা রয়েছেন। আজকে যদি সত্যিই ধর্মিকতা, ঈশ্বরানুরাগকে একটি রাজনৈতিক গুণ বলে ধরা হয় সেক্ষেত্রে ভোটাররা সেই দলকে কেন বা কী কারণে বেছে নেবে যারা এটাকে হঠাৎ আবিষ্কার করল।

(লেখক ওয়াশিনটন ডিসি-র আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউটের ফেলো)

দাঙ্গাবাজ ধরলেই চাকরি!

গত ৫ মার্চ দুর্গাপুরের এক দলীয় কর্মীসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যের বিজেপি-আর এস এস-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন। তিনি বিজেপি ও আর এস এস-কে দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গার ফেরিওয়ালা ইত্যাদি বলে গালাগাল দিয়েছেন। এমনকী, তিনি দাঙ্গাবাজদের ধরতে পারলেই পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন (ধরো দাঙ্গাবাজ, পাও পুরস্কার)। চাকরির লোভ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, দাঙ্গাবাজ (বিজেপি-আর এস এস) ধরতে পারলেই মিলবেই পুরস্কা, চাকরি ইত্যাদি।

তৃণমূল নেত্রীর মনে রাখা উচিত, তিনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, প্রশাসনিক প্রধান। পুলিশ মন্ত্রীও বটে। তাই তাঁর বাক্‌সংযম প্রয়োজন। কিন্তু তিনি তা মানছেন না। উল্টে তিনি সভা-সম্মেলনে বিজেপি, আর এস এস, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিরোধী নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। তাঁর কাছ থেকে এহেন আচরণ অনভিপ্রেত। সংসদীয় গণতন্ত্রে সমালোচনা, ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকার আছে। তাই বলে বিরোধী পক্ষকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করা, গালিগালাজ করা, দাঙ্গাবাজ বলে উস্কানি দেওয়া— এসব মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশা করে না রাজ্যের সচেতন মানুষ।

তৃণমূল সুপ্রিমোর স্মরণ থাকা উচিত, একদিন তিনি কিন্তু ছিলেন বিজেপি সমর্থক, এনডিএ জোটের শরিক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রশংসা করতেন আর এস এস-এর। আর আজ তারা হয়ে গেল দাঙ্গাবাজ? এতবড় রাজনৈতিক ভণ্ডামি? এসব কি মুসলমানদের খুশি করতে নয়? মুসলমান ভোটে দাঁও মারতে নয়? আর আপনি দাঙ্গাবাজ বিজেপি-আর এস এস সমর্থকদের হাতেনাতে ধরতে পারলেই চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন— এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন, আপনি তো পুলিশমন্ত্রীও বটে, পুলিশ রেকর্ড ঘেঁটে দেখুন না, বিজেপি-আর এস এস-এর দাঙ্গাবাজ, অপরাধীর সংখ্যা কত। আর তৃণমূলের কত। প্রতিদিনই তো এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৃণমূলের সংঘটিত গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে হতাহত হচ্ছে তৃণমূলিরা। ধর্ষণ, খুনোখুনি, তোলাবাজি, রাহাজানি, গোষ্ঠীদাঙ্গা, মারপিট ইত্যাদিতে তৃণমূলিদের জুড়ি মেলা ভার। আর এসবে ক'জন বিজেপি-আর এস এস নেতা-কর্মী জড়িত? মনে রাখতে হবে, বিজেপি-আর এস এস দেশভক্ত। দাঙ্গাবাজ নয়।

এমনিতেই এ রাজ্যে আজ বেকারত্ব পর্বত প্রমাণ। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার একটা যে কোনও চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। যে রাজ্যে চাকরি প্রায় নেই, সেই রাজ্যে তৃণমূলের দাঙ্গাবাজ ধরনেওয়ালাদের মধ্যে চাকরি কোথা থেকে বিলোবেন মুখ্যমন্ত্রী? জানি, এ প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে নেই। আর নেই বলেই তো আপনি বেকারদের তেলেভাজা, মুড়িভাজার ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া এ রাজ্যে ধুলাগড়, বসিরহাট, ক্যানিং, কালিয়াগঞ্জ, কাটোয়া, জুরানপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ কাণ্ড মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় সন্ত্রাসবাদীদের কাজ। তাই দাঙ্গাবাজ আর বিজেপি-আর এস এস-এর মধ্য থেকে খুঁজতে হবে না, নিজের দলের মধ্যেই খুঁজুন।

আপনাকে অনুরোধ, আগুন নিয়ে খেলবেন না। দাঙ্গায় উস্কানি দেবেন না। কারণ চাকরির লোভে তৃণমলিরা দাঙ্গা বাঁধাতে পারে। আর তৃণমূলিরা দাঙ্গাবাজ ধরলে পুলিশ আছে কোন্ কম্মে?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক ময়দান ক্রমশই সরগরম হয়ে উঠছে। আর এই নির্বাচন গ্রামভিত্তিক হওয়ার কারণে হিংসা, পক্ষপাতিত্ব, বাহুবলে অনেক ক্ষেত্রেই জনমত পদদলিত হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকলেও পুরো ভোট প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য-সরকার। ফলে

নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও অনেক সময় হ্রাস পেয়ে যায়। প্রশাসন যদি নিরপেক্ষ ও সজাগ থাকে তবে নির্বাচনে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়। গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নির্বাচনের স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছতার ওপর। তাই ভোটাধিকার যদি স্বাধীনভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রয়োগ না করা যায় তবে গণতন্ত্র শব্দটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ রাজ্যে বাম সন্ত্রাসের মতোই তৃণমূলি সন্ত্রাসে গণতন্ত্র ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে চক্রান্ত করে প্রশাসনিক মদতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এ রাজ্যে শাসকের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়ে দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন কতটা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হবে তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

এছাড়াও নির্বাচনের পরে বিরোধী জয়ী প্রার্থীদের যেনতেন প্রকারে দলবদল করানোর প্রচেষ্টা থাকে এ রাজ্যে শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে। কিন্তু এই দলবদল হলো সাধারণ মানুষ ও নিজ দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ। একে সংবিধান বিরোধী বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই দলত্যাগের কারণ ব্যক্তিগত লোভ বা প্রাণের ভয় বা প্ররোচনাও হতে পারে। গত পঞ্চায়েত বা অন্য নির্বাচনের পর বিরোধী জয়ী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এধরনের উদাহরণ অনেক আছে। এ ব্যাপারে কঠোর আইন করার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় এ ধরনের ঘটনা নির্বাচনী পরিহাস বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু মানুষ দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্রের পূজারি। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপর মানুষের আস্থা, বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। ত্রিপুরা জয়ের পর বাংলা জয়ের লক্ষ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি সফল হলে তা ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর এবারের নির্বাচন

শাসকদলের সঙ্গে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয়তাবাদী বিজেপির লড়াই বলাই শ্রেয় হবে। কিন্তু নির্বাচনের পর জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা যাতে তৃণমূলি ফাঁদে পা না দেন সে ব্যাপারে নেতৃত্বের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। অন্যথায় সাধারণ মানুষের আস্থা, বিশ্বাসের প্রতি চরম অবমাননা করা হবে। যার প্রভাব পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে পড়তে পারে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

কৃষিকাজ করতে হবে চিরন্তন ভারতীয় প্রথায়

স্বাধীনতার ৭১ বছর পরেও আজ কৃষককে রাস্তায় নেমে কৃষিঋণ বা বিদ্যুতের মাশুল মকুব করার দাবি জানাতে হচ্ছে, এটা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। কৃষিতে কেন যথেষ্ট রোজগার নেই, কৃষককে কেন এখনো প্রকৃতি, রাসায়নিক উৎপাদন এবং দালালদের ওপর নির্ভর করতে হয়, কেন দেশের ৫৮ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও কৃষিজাত পণ্য জিডিপির মাত্র ১৭ শতাংশ? কৃষক চাষআবাদ ছেড়ে অন্য কাজে চলে যাচ্ছেন? কৃষকের পরবর্তী প্রজন্ম কৃষিকাজ করতে চাইছেন না, এ তো মারাত্মক প্রবণতা। কৃষি উৎপাদন বর্তমান হারে হতে থাকলে ভারত ২০৩০-এর পর খাদ্যদ্রব্যে স্বনির্ভরতা হারাবে, আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে জন-অসন্তোষ ও বেকারি। আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত তো?

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি এককালে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ইংরেজদের এবং পরবর্তীকালে ব্রাউন সাহেবদের হাতে পড়ে তার সর্বনাশ হয়েছে। ১৯৬০-এর আগে শিল্পপতিরা কৃষিতে ঢোকেননি, যার ফলে জোর করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হতো না, আমাদের জলবায়ু অনুকূল ছিল, আমাদের শরীর এবং মনও সুস্থ ছিল। যেদিন থেকে ব্যবসাদারের লোভ এসে কৃষির ঘাড়ে চেপে বসেছে, সেদিন থেকে ভারতের মাটিতে বিষ ফলতে শুরু করেছে। আমাদের পাতে বিষ পরিবেশিত হচ্ছে রোজ। এদিকে সাধারণ কৃষকের আর্থিক অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কৃষক কিন্তু তাঁর ফসলে কখনো ভেজাল মেশান না। চালে কাঁকর, লঙ্কাগুঁড়োতে কাঠেরগুঁড়ো ইত্যাদি মুনাফাবাজরা মেশায় আর ২ টাকায় সবজি কিনে ২০ টাকায় তারাই বিক্রি করে। কৃষকের দৈন্যদশা আর ঘোচে না, তাঁরা দাদনের চক্রব্যূহ থেকে সারা জীবনেও মুক্তি পান না।

প্রকৃতি কারুর ক্রীতদাস নয় যে যখন যেমন ইচ্ছে তাকে ব্যবহার করা যায়। গাছ প্রায় ৯৪ শতাংশ পুষ্টি জল, বাতাস ও সূর্যের আলো থেকে নেয়, মাত্র ৬ শতাংশ নেয় মাটি থেকে। সেই মাটির হাজার হাজার উপাদানের মধ্যে থেকে স্থান কাল পাত্রভেদে গাছ কেবল ১৬টি থেকে ৩২টি (বিভিন্ন মত আছে) উপাদান গ্রহণ করে। আর আমরা সেই সামান্য কটা উপাদান নিয়ে খোদার ওপর খোদগিরি করতে সদাব্যস্ত। প্রকৃতিপ্রেমী সাজার অভিনয় করতে গিয়ে জল জমি হাওয়া সব দূষিত করে ফেলে ভারতের পারম্পরিক কৃষি অর্থনীতির ধাঁচাটাই ভেঙে তছনছ করে ফেললাম আমরা। জমি যত বেশি বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আমরা তত বেশি রাসায়নিক সার দিচ্ছি, কীটের আক্রমণ ঠেকাতে মনের সুখে বিষ ছড়াচ্ছি, আর জলস্তর যত নামছে, আমরা পাইপও ততটাই নীচে নামিয়ে চলেছি। আমাদের ইনপুট কস্ট বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে অথচ অপরিকল্পিত ফলন ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় অনেক সময়ই ফসলের দাম পাওয়া যাচ্ছে না, কৃষক ভিক্ষাপাত্র হাতে সরকারের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছে।

ভারতের কৃষক আসলে সেদিন সর্বহারা হয়েছেন যেদিন তাঁর বাড়ি থেকে দেশীয় গোরু বিদায় নিয়েছে। ডায়ামোনিয়াম ফসফেট ব্যবহার করে করে জমির নাইট্রোজেনের ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রাকৃতিক রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়াকে মেরে ফেলে চাষের জমিতে ফসলের নামে আজ যে বিষ উৎপন্ন হচ্ছে, তার একমাত্র অ্যান্টিডোট হলো গোবর সার ও গোমূত্র। ফসল বিষমুক্ত করতে হলে গোরু চাই আর গোরু থাকলে সারের খরচ বাঁচে। বাড়ির গাছের নিমপাতা আর গোমূত্রের মিশ্রণে তৈরি কীটনাশক ব্যবহার করে অন্য খরচাও বাঁচে, রোজগার বাড়ে, সমাজটাও সুস্থভাবে বাঁচে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? গোচারণ ভূমি নেই, দুধের যা দাম পাওয়া যায় তা দিয়ে চারার খরচটা কোনোমতে ওঠে, তেমন লাভ নেই। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলো একটি ট্র্যাক্টার ষোল জোড়া বদলের সমান ছোট জমিতেও হ্যান্ড হেল্ড টিলারে কাজ হয়ে যাচ্ছে। বলদ নিয়ে কৃষক করবেটা কী? গোবর আর গোমূত্র যদি নিয়ম করে চাষে ব্যবহার করা হতো তাহলেও নাহয় কথা ছিল কিন্তু ওই সবুজ বিপ্লবের নামে আমরা যে কৃষককে বুঝিয়েছি অধিক ফলন মানে রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার। এটা তো তাঁদের বলিনি যে, এই পেট্রোলিয়াম একদিন মাটিতে মিশে গিয়ে জমিকে বন্ধ্যা করে দেবে। আজ যদি বলি বিষমুক্ত কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণভাবে গোরুকে জুড়তে পারলে তবেই সত্যিকারের সাশ্রয় ও আয় বৃদ্ধি ঘটবে। শুধু গোবর আর গোমূত্র, যা মাটির পরম বন্ধু কেঁচোর প্রধান খাদ্য, তার জন্যই গোপালন করুন, কৃষক মানবেন কেন?

আর একটি বিষয় হলো কৃষিজাত দ্রব্যের অকারণ অপচয়। রাষ্ট্র সঙ্ঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশান তাঁদের ২০১৮-র রিপোর্টে বলছে, পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়। আমাদের দেশে ব্লকস্তরে কোল্ড স্টোরেজ, গোডাউন এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মালবাহক গাড়ির এত অভাব যে কৃষক অন্ধ্রে ৫০ পয়সা কেজি দরে টমেটো বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন, উত্তরপ্রদেশে আলু ১ টাকা কেজিতে। এই অব্যাবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রায়শই সবজি জলের দামে বিক্রি হয়। অবশ্য সদিচ্ছা থাকলে সমস্ত কিছুরই সমাধান সম্ভব, কিন্তু প্রথম প্রয়োজন কৃষককে বৃত্তাকারে চলতে থাকা খয়রাতি ও বিক্ষোভের রাজনীতি থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র তার রোজগার বাড়ানোর লক্ষ্যে গোভিত্তিক দালাল-মুক্ত মূল্য-সংযোজিত কৃষির লক্ষে নীতিনির্ধারণ করতে হবে।

—সঞ্জয় সোম,
কলকাতা-২৯।

বাংলার ব্রত ‘অশোক ষষ্ঠী’

স্বপন দাশগুপ্ত

বাংলার লোকসাহিত্যে রূপকথা, উপকথা ব্রতকথা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রতকথাগুলিতে অন্তঃপুরের মহিলাদের দ্বারা লৌকিক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মহাত্ম্যগান রচিত হয়েছে। ব্রতকথাগুলি একসময় বাংলার লোকসমাজে খুব জনপ্রিয় ছিল। এরমধ্যে একটি হলো ‘অশোক ষষ্ঠী ব্রত’। যেটি সাধারণত চৈত্রমাসে পালিত হয়। অনেক শিক্ষিত মহিলা এই ব্রত পালন করলেও এ সম্বন্ধে কোনও সঠিক তথ্য দিতে পারেন না। কেউ কেউ সম্রাট অশোককে এই ব্রত প্রবর্তকের কথা উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ অশোকবনে সীতার কথা স্মরণ করে এই ব্রতের উল্লেখ করেন। আর কিছুদিন পরেই ‘অশোক ষষ্ঠী’ ব্রত পালিত হবে। এই ব্রতের প্রাচীন কাহিনি বা প্রচলিত গল্পের কথা উল্লেখ করা হলো।

এক আশ্রমে প্রচুর অশোক গাছ ছিল। সেই আশ্রমে এক ঋষি কুটিরে বাস করতেন। একদিন তিনি একটি অশোকগাছের তলায় একটি অতি সুন্দরী বালিকাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। মেয়েটির বিপদের কথা চিন্তা করে দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাকে আশ্রমে নিয়ে এসে পালন করতে লাগলেন। অশোকতলায় পেয়েছিলেন বলে তিনি মেয়েটির নাম রাখলেন ‘অশোকা’। ক্রমে মেয়েটি অপরূপ রূপবতী হয়ে যৌবনে উপনীত হলো। মেয়েটিকে একা আশ্রমে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে তিনি পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলেন না।

সেই সময় এক রাজা মৃগয়া করতে অশোকবনে উপস্থিত হলেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা খুঁজতে খুঁজতে ঋষির আশ্রমে কুটিরে এসে জল প্রার্থনা করলেন। কুটির থেকে এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। প্রশ্ন করে জানতে পারলেন মেয়েটি এই কুটিরের মুনির কন্যা। তার নাম অশোকা। অশোকা বলল, ‘মুনি ধ্যান করতে গেছেন, সন্ধ্যার পর ফিরে আসবেন।’ তখন রাজা একটি অশোকগাছের তলায় বিশ্রাম নিতে লাগলেন। সন্ধ্যার পর বেদপাঠ করতে করতে ঋষি যখন আশ্রমে ফিরছিলেন তখন রাজা ঋষিকে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললেন, ‘আপনি দয়া করে আপনার কন্যাটিকে দান করলে আমি তাকে বিয়ে করে রানির মর্যাদা দিয়ে নিয়ে যেতে পারি’। ঋষি মনে মনে খুব খুশি হয়ে অশোকাকে রাজার হাতে সমর্পণ করলেন।

যাবার সময় মুনি অশোকার হাত ধরে তার আঁচলে কতকগুলো অশোকফুল ও বীচি দিয়ে বললেন, ‘মা, তুমি এই ফুলগুলো শুকিয়ে রেখো আর এই বীচিগুলো রাস্তার দুধারে ছড়াতে ছড়াতে রাজধানী পর্যন্ত যাবে। রাজার বাড়ি পর্যন্ত এই বীজগুলো থেকে অশোকগাছ জন্মাবে। যদি কোনোদিন তুমি কোনো বিপদে পড় তাহলে ওই গাছের সারি দেখে আশ্রমে আসবে। আর অশোক ষষ্ঠীর দিনে কখনও অন্ন গ্রহণ করবে না। তুমি ষষ্ঠীকে পূজা দিয়ে ছটা অশোক কুঁড়ি, ছটা মুগকলাই, দই একসঙ্গে মুখে দিয়ে জল খাবে। গিলে খাবে, দাঁতে যেন না লাগে।’

অশোকা মুনির কথামতো বীচি ছড়াতে ছড়াতে রাজবাড়ি গেল। রাজবাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি বউকে বরণ করে ঘরে তুললেন। রাজা অশোকাকে নিয়ে পরম সুখে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কালক্রমে অশোকার ছয় ছেলে ও এক মেয়ে হলো। বয়সকালে তাদের বিয়ে-থা দিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি স্বর্গে গমন করলেন। রাজাও কিছুদিন পর স্বর্গে গেলেন।

চৈত্রমাসে অশোকষষ্ঠীর দিন অশোকা বৌমাদের বললেন, ‘আজ অশোকষষ্ঠী, আমি আজ অন্ন গ্রহণ করব না।’ এই কথা শুনে বৌমারা তাড়াতাড়ি মুগকড়াই সেদ্ধ করে অশোকাকে খেতে দিল। নিয়ম মেনে ষষ্ঠীপূজা করে খেয়ে অশোকা শুয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখল সবাই মরে পড়ে আছে। কিছু বুঝতে না পেরে সে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে অশোকার মুনির কথা মনে পড়ল। তখন সে অশোক গাছ বরাবর রাস্তা চিনে আশ্রমে এসে মুনিকে সব কথা খুলে বললো। মুনি ধ্যান করে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরে অশোককে বললেন, ‘মা, তুমি যে মুগকলাই সেদ্ধ করে খেয়েছ, তাঁর মধ্যে একটা ধান ছিল, সেই ধান সিদ্ধ হয়ে ভাত হয়েছে। তা খেয়েই এই বিপত্তি’। ঠিক আছে আমি তোমাকে মন্ত্রপুত জল দিচ্ছি, তুমি বাড়ি গিয়ে এই জল ছিটিয়ে দিলে সবাই আবার বেঁচে উঠবে। অশোকা বাড়ি ফিরে এসে জল ছিটিয়ে দিতে সবাই উঠে বসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সমস্ত রাজ্যে এই কাহিনি ছড়িয়ে পড়লো। ষষ্ঠীর মহিমা শুনে সবাই ‘অশোক ষষ্ঠী’ পালন করতে শুরু করল। রাজাও সমস্ত রাজ্যে এই ব্রত পালন করতে আদেশ দিলেন। রাজ্য জুড়ে ‘অশোকষষ্ঠী’ পুজোর প্রচার হলো।

বাসন্তী পূজার শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে এই পূজা পালিত হয়। তিথি অনুসারে এই ব্রত চৈত্র বা বৈশাখ মাসেও হতে পারে। এই ব্রত পালন করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয় না, পুত্র-কন্যারাও শোক-দুঃখ ভোগ করে না।■

বাংলার মুখোশ শিল্প

চূড়ামণি হাটি

হিংস্র জীবজন্তুর ভয় কিংবা অশরীরী অশুভ শক্তির কল্পনা। এসব মানুষকে নানাভাবে ভাবিয়েছে। প্রথম প্রথম অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রেখে আর অলৌকিক ভাবনার উপর বিশ্বাস রেখে মানুষ মুক্তির উপায় খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছিল। বিরুদ্ধ শক্তিকে ভয় দেখানো ও বশীভূত করার প্রয়োজন থেকেই দেহচিত্রের বিকল্প হিসাবে মুখোশের ব্যবহারিক সূচনা। শুধুমাত্র শরীরের মাধ্যমে যে অনুভূতির প্রকাশ সম্ভব নয়, মুখোশের মাধ্যমে তা প্রকাশের চেষ্টা। মুখোশের আড়ালে অদৃশ্য থাকার অর্থই হলো নিজেকে গোপন করে অন্য রূপে নিজেকে প্রকাশের চেষ্টা। ভাবাশ্রয়কে সঙ্গী করে গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যে যে রসবোধ কাজ করে, পরবর্তীকালে তারই প্রকাশ ঘটল মুখোশ নৃত্যে।

এই মুখোশগুলিকে সঙ্গী করে একদিন যা ছিল বিরামহীন যুদ্ধের প্রস্তুতি, পরবর্তীকালে তা নান্দনিক চেহারা নিয়ে হয়েছে বিনোদন মাধ্যম। পৃথিবীর সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন মুখোশধারীকে দেখা যায় ফ্রান্সের ত্রোয়িস ফোরেসের গুহাচিত্রে। বল্গা হরিণের মুখোশ। এ এক জাদুমূলক অদ্ভুত ভাবনাও বটে। দেবদেবী এবং দেবদেবীর বাহনের রূপ কল্পনার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এ ভাবনা কাজ করেছে। বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে মুখোশ নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচিত্র রূপে উপস্থিত হয়েছে। মন্দির বা মূর্তির শীর্ষদেশে থাকা মুখ বা কীর্তিমুখো যেমন নানা কু-নজর থেকে রক্ষা করে, তেমনি বাংলার ধান ক্ষেত বা আলু ক্ষেত রক্ষা করছে ক্ষেত-রাক্ষস বা কাকতাড়ুয়ারা। প্রয়োজনে পোড়ামাটির হাঁড়ি বা সরায় ভুসোকালি লেপে তৈরি হয় তার মুখ। এইরকমই সহজ সরল মনোভাব নিয়েই লৌকিক সমাজ তৈরি করেছে মুখোশগুলি। বিশেষ মনোভাবের স্থির প্রতীকগুলিকে।

সুন্দরবন অঞ্চলের হিংস্র জন্তুদের ঠকানোর জন্য তৈরি হয়েছে ঘাড় মুখোশ। এ মুখোশ মুখে না পরে মুখের পেছন দিকে ঘাড়ের অংশ আবৃত করে থাকে। পেছনে হঠাৎ আসা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এমন ভাবনা। হিংস্র জন্তুদের বিভ্রান্ত করতেই তৈরি হয় বড় বড় চোখওয়ালা এই মুখোশগুলি। এ মুখোশগুলি মূলত পোড়ামাটি কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরি। বাংলার চেনা ছবিতে ছিল

চৈত্র মাসে মহাদেব নৃত্য। নির্দিষ্ট খোলা প্রাঙ্গণে এসে ঢোলক বাদক ঢোল বাজান। অন্যজন উঁচু করে মুখোশটি তুলে ধরে ভূমিকে প্রণাম করে নৃত্যের জন্য তৈরি হন। তারপর কেউ একজন মুখোশটি বেঁধে দেন। মুখোশ বা মুখার ঘর্ষণ থেকে মুখ রক্ষা করার জন্য কান ঢেকে পাগড়ি বাঁধা হয়। সাদা-কালো রঙে রাঙানো তিন বা পাঁচটি সাপের ফণা নিয়ে সাজানো মহাদেবের মুখোশ।

যুদ্ধের প্রস্তুতি বা যুদ্ধ জয়ের আনন্দ নৃত্যের মাধ্যমে নান্দনিক চেহারা নিয়েছে। যেমন ছৌ নৃত্য আসলে ছিল শারীরিক পটুত্বের পরিচয় দিয়ে সাধনায় সিদ্ধি লাভ। ছৌ নৃত্যের 'কাপ ঝাপ' এই ইঙ্গিত দেয়। ছিল চুন-কালি মেখে নাচ। ১৭৫৩ সাল নাগাদ সামন্ত রাজাদের ডাকে বর্ধমান থেকে মৃৎ শিল্পীরা এসেছিলেন রাধাগোবিন্দ মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণের জন্য। এই শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তৈরি হয়েছিল রঙিন মুখোশ। আর কথকঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নানা পৌরাণিক চরিত্রের মুখের নানান বৈচিত্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিয়েছিলেন পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি অঞ্চলের চরিদা গ্রামের সূত্রধরেরা। প্রথমে কেঁচো মাটি বা নরম মাটির মুখ তৈরি। তারপর ছাইয়ের প্রলেপ দেওয়া। তারপর আঠা দিয়ে একটির পর একটি কাগজ সাঁটা। রোদে শুকিয়ে পাতলা মাটির আস্তরণ চাপানো। চোখ-মুখ ঠোঁটের ভাঁজ স্পষ্ট করা। মাটির গোলাতে ভেজানো সুতির কাপড় সেঁটে দেওয়া। শুকিয়ে গেলে ঠোকা মারলে খুলে যায় মাটির মুখ। এরপর মুখোশটি পেপরা গাছের পাতা দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়। রঙ করা হয়। শেষে জরি, রাংতা, চুমকি, পুঁতি ও পালক লাগিয়ে মুখোশটির সাজ সম্পূর্ণ হয়। প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে, কোনও

লৌকিক বিষয় গুরুত্ব পায়নি। আবার বাংলার ডোম সমাজ নানা পরিস্থিতিতে তুলে ধরেছিল তাদের বীর রূপ। 'আগডুম-বাগডুম' এই লোক ক্রীড়ার ছড়াটিও তার সাক্ষী। দুর্গ অর্থে ছাউনিতে যে নৃত্য চর্চা, তাই হলো সৈন্য সাজে ছৌ নৃত্য। নীচু শ্রেণীর যুদ্ধ সংলাপহীন। নদীয়ার তেহট্ট-১ ব্লকের নফরচন্দ্রপুর গ্রামের মালপাহাড়ি বনবাসী গোষ্ঠী মাঘীপূর্ণিমার রাতে তির ধনুক পুজো উপলক্ষে এবং শিকারে যাওয়ার আগে সোনার তৈরি মুখোশ পরে নৃত্য করেন। সঙ্গে বাজে ঢোল-কাঁসি। রামায়ণ যুদ্ধ, শূকর শিকার এগুলি নৃত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। নদীয়ার নাজিপুর ও বেতাইয়ে মুখোশ তৈরি হয়।

মেদিনীপুর জেলার বেলিয়াবেড়ার নোটা ও চেনাবাড়িয়া গ্রামের দলাই পদবিধারীরা কাগজ-কাপড়-কাদামাটি দিয়ে তৈরি করেন নানা ধরনের রঙিন মুখোশ। মুখোশের বিষয় পৌরাণিক চরিত্র, ভুত প্রেত, রাক্ষস, পশু-পাখি। এ মুখোশগুলি শীতলার গান, বহুরূপী ও সঙ সাজে ব্যবহৃত হয়। রাধা-কৃষ্ণের গীত নিয়ে কাঠি নৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার লক্ষণীয়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ফৌজদার সূত্রধররা গামার কাঠ দিয়ে তৈরি করেন রাবণ কাটা নৃত্যের মুখোশ। লবণ, নিমফল, তুঁতে মেশানো গরম জলে গামার কাঠ দু-তিন দিন ভিজিয়ে রেখে তৈরি হয় এই মুখোশ। কতটা জোরে মারতে হবে, কতটা কাটতে হবে, এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তৈরি হয় কাঠের মুখোশ। দুর্গা পুজোর শেষ তিন দিন বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ জিউ মন্দিরকে ঘিরে চলে রাবণকাটা নৃত্য। কুম্ভকর্ণ বধ দিয়ে শুরু। একাদশীর দিন বধ হয় ইন্দ্রজিৎ। দ্বাদশীর দিন রাবণ।

বীরভূমের ধর্মরাজের ভক্তরা কাঠের চামুণ্ডা মুখোশ পরে নৃত্য করে। জয়নগরের কালীনৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বনবিবি পালায় বাঘের মুখোশ গুরুত্ব পায়। মেদিনীপুর ঝাড়খণ্ড সীমান্তে মুখোশ পরা নাচকে বলে মহড়া নাচ।

অখণ্ড দিনাজপুরের চামুণ্ডা পুজোর দেবীর রূপ হলো একটি মুখোশ। চৈত্র সংক্রান্তিতে ত্রিমোহিনী গ্রামে দাপট কালীর পুজোয় একটি ভগ্ন শিলাখণ্ডকে মুখোশ পরিয়ে পুজো করা হয়। আবার গাছে মুখোশ বেঁধে দক্ষিণ দিনাজপুরে শ্মশান কালীর পুজো হয়। মালদার জহুরা কালীও একটি মুখোশ। চৈত্রমাসে মালদায় গম্ভীরা পুজো উৎসবের দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনের তামাশা পর্বে শিবের বন্দনা করে হয় মুখোশ নৃত্য; অবশ্য পালাগানে মুখোশের ব্যবহার নেই। এই নৃত্যে নিম কাঠের নরসিংহী মুখোশটি বেশ বড়। দীর্ঘ নাক, বড় লাল জিভ এবং দুটি শিং নিয়ে অদ্ভুত রূপ। কালীকাচ নৃত্য হলো বেতের অর্থাৎ 'কাচে'র আঘাতে বেজে ওঠা ঢাকের বোলের সঙ্গে সঙ্গে মুখোশ নৃত্য। জলপাইগুড়ির গাইযাত্রা নৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার আছে। তেল সিঁদুর দিয়ে পুজো করে তুলে রাখা মুখোশ ঘর থেকে বের করে এনে তা মুখে এঁটে রাজা, মন্ত্রী, চাকর, বাঘ এরকম নানা চরিত্র নিয়ে জলপাইগুড়ির মুখাখেইল নৃত্য। দিনাজপুরে গোমিরা উৎসবে গ্রাম চণ্ডীর সম্মানে গামিরা খেলা যা মূলত উত্তর দিনাজপুরের পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর। মুখোশ শিল্পীরাও কাঠের মুখোশ তৈরির পাশাপাশি বাঁশের মুখ বা মুখোশ তৈরি করে এই শিল্প মাধ্যমটিকে বেশ আকর্ষণীয় করেছেন। জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুরে কালীপুজোর অমাবস্যা তিথিতে চোর-চুরণীর গানে শোলার মুখোশ ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গে মুখোশকে বলা হয় মোখা। দার্জিলিংয়ে দেখা যায় সিংহের মুখোশ নিয়ে তিব্বতীয় মুখোশ নৃত্য সিঙ্গীছম, মুখোশ পরে ভুটিয়াদের মহাকাল নৃত্য এবং জনজাতিদের ডাইনি- পিশাচ নৃত্য গুমরিমতি পালায় ব্যবহৃত হয় মেচ মুখোশ। ঝাড়গ্রামের পারভা নাচের কাঠের মুখোশগুলি বেশ বড়। কথিত আছে চিলকিগড় রাজবাড়ির পাইকরাই একসময় এই নাচ করতেন।

দেবতার থানে ছলন দেওয়ার রীতি

কিংবা টোটেম-স্মৃতির মতো মুখোশকে ঘিরে থাকা লোকাচার-বিশ্বাসের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে অলৌকিক ভাবনা বা জাদু বিশ্বাস। মুখমণ্ডল বা মূর্তি তৈরির পাশাপাশি তৈরি হলো চামরা-গাছের ছাল এবং পরবর্তীকালে মাটি ও কাঠের মুখোশ। আবার পুজো-পার্বণের আনন্দকে নতুন মাত্রা দিতে গুরুত্ব পেল মুখোশ নৃত্য। মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব নিয়ে নৃত্যের আবেগেও নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরি হলো। গুরুত্ব পেল কাহিনি বা কয়েকটি মুহূর্ত। নানা চরিত্র নিয়ে সেজে উঠলো মুখোশ। এই বৈচিত্র্য গুণে পরবর্তীকালে মুখোশ যেমন শিশুদের খেলনা হয়ে উঠলো তেমনি গৃহসজ্জার উপকরণ।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুসমুণ্ডির কাঠের মুখোশের পাশাপাশি সস্তার বাঁশের মুখোশও গুরুত্ব পেলো। পুরুলিয়ার চরিদায় কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি হলো ঘর সাজনোর নানা মুখোশ। বর্তমানে নিত্যনতুন মুখোশ তৈরি হচ্ছে। মুখোশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লৌকিক আবেগ ও জাদু বিশ্বাস মুখোশের আড়ালেই লুকিয়ে পড়েছে। শিল্পী বাঁচতে চায়। ■

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেমে থাকলে চলবে না

মাধবী মুখার্জী

প্রতিবাদ শব্দটা আসলে খুব আপেক্ষিক। দেশ কাল নির্বিশেষে প্রতিবাদের পরিবেশ এবং প্রতিবাদীর চরিত্রভেদে প্রতিবাদের ধরন আমূল পালটে যায়। সব প্রতিবাদ সামাজিক নয়। সমাজকে নাড়া দেবার জন্য খানিকটা দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে হয় সামাজিক প্রতিবাদকে। কিন্তু প্রতিবাদ যেখানে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তাও আবার পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে একুশ শতকের পটভূমিতে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ কারুর প্রতিবাদ বা মত প্রকাশের কোনওরকম স্বাধীনতা নেই। সামান্যতম সমালোচনা মিডিয়া বা পত্রপত্রিকায় করলেই গ্রেপ্তারের ভয় দেখায় পুলিশ প্রশাসন। সংবিধান প্রদত্ত মত প্রকাশ অথবা প্রতিবাদের স্বাধীনতা নেই আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে।

মিছিল, মিটিং, সেমিনার, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর নানাভাবে পালিত হয় নারী নির্যাতন বিরোধী পক্ষ। কিন্তু এমন পক্ষ পালনের মাধ্যমে কতটা কমেছে নারী লাঞ্ছনা, নারী নির্যাতন, অপহরণ এবং ধর্ষণের মতো এমন পৈশাচিক ঘটনা? বরং বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দাবানলে দগ্ধ হয়েও প্রতিক্রিয়াবিহীন এমন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সময় এসেছে। পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তিত রূপ যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যতই আধুনিক হচ্ছি ততই আমাদের আচরণে সংযমের মাত্রা কমছে, হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ। আর তার শিকার হচ্ছে ৮ থেকে ৮০ বছরের শিশু ও মহিলা।

পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, কাটোয়া মধ্যমগ্রাম, বোলপুর, ধূপগুড়ি, শিলিগুড়ি ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে তালিকাটা। পশ্চিমবঙ্গে গত ৬০ মাসে রাজ্যে নারী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম ঘটনার লজ্জা বহন করছে এই এক একটি নাম।

যেখানে শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী, যুবশ্রী, কন্যাশ্রীদের এভাবে রোজ ধর্ষিতা খুন হতে হয়, কন্যাদের দিয়ে চলে দেহব্যবসা, সেখানে দাবি করা হয় 'এগিয়ে বাংলা'।

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষিত 'বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা, মহিলা সুরক্ষা, ধর্ষণ, রাজনৈতিক হত্যা ও জঙ্গলমহলে খুনখারাবি

কমেছে।' কতটা কমেছে তা বোঝাতে বাম আমলের নেতাই গণহত্যা, নানুর, সাঁইবাড়ি, গণহত্যা ও নন্দীগ্রামের কাণ্ডের মতো কিছু ঘটনার সঙ্গে তুলনা টেনে নিজেই নিজের ঢালাও প্রশংসা করা হচ্ছে। কিন্তু এই আস্ফালনের ফানুসটি ফেটে যায় ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্টে। যে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য উদ্ধৃত করে এই দাবি এই দাবি করা হয়েছিল, তাদেরই রিপোর্ট জানিয়েছে, ২০১১ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ নারী নির্যাতনে দেশের প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তথ্য অনুযায়ী ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ২৯,১৩৩টি মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১২ সালে সেই পরিসংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ৩০, ৯৪২। পর পর দু'বার নারী নির্যাতনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় ক্ষুব্ধ হয়ে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোকে তথ্য পাঠাতেই নিষেধ করা হয়েছিল সরকারের তরফে। বর্তমানে আইন শৃঙ্খলার এমন অবনতি নকশাল আমলের পরে বাংলার মানুষ দেখেনি।

সরকারি হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি। মহিলা কমিশন বলছে, নারী নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা এই সরকারি পরিসংখ্যানের চেয়েও অনেক বেশি। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন। সেখানে বর্তমানে মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের ১৪.৭ শতাংশই ঘটছে এই রাজ্যে। এ রাজ্যে সব থেকে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে শহরে। মহিলাদের ওপর ৪৮.২ শতাংশ অপরাধের ঘটনা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলা হয়েছে রাজ্যে ধর্ষণের হার জাতীয় হারের থেকেই দ্বিগুণ।

মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বহু ঘটনা পুলিশের কাছে পৌঁছয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের অভিযোগ নিতেই চায় না পুলিশ। সে কারণে আইনের একটি বিশেষ ধারা ব্যবহার করে অভিযোগ দায়ের করতে হয়। এতেই প্রমাণ হয় যে পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না।

এই রাজ্যে নারীর নিরাপত্তা এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। এই প্রশ্নে রাজ্য সরকারের নির্লিপ্ত মনোভাবের সমালোচনা করা হয়েছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের ঘটনা বেশি হলেও রাজ্য জুড়ে পালিত হয় নারী দিবস। ২৫ নভেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক ভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার অবলুপ্তির দিন বলে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। নারী নিগ্রহ নিয়ে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে চলছে প্রচারাভিযান। কিন্তু তাতেও অত্যাচারের মাত্রা কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

লজ্জার বিষয় যে, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন নারী, তবু নারী নির্যাতনে এই রাজ্যই দেশের মধ্যে প্রথম। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষণকে 'সাজানো ঘটনা' বলেন। ধর্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। প্রতিবাদ করলে তাকে 'মাও' আখ্যা দেওয়া হয়।

আমি নিয়মিত প্রগতিবিরোধী প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করছি। প্রতিপক্ষের করাত যতই ধারালো হয়ে উঠুক না কেন, নারী সমাজের থেকে প্রতিবাদ থেমে থাকলে চলবে না।

রাজ্যসভায় বিনয় কাটিয়ার যথার্থ বলেছেন

দেবব্রত চৌধুরী

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা অধুনা রাজ্যসভার সদস্য বিনয় কাটিয়ার কিছুদিন আগে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, ''ভারতবর্ষের এখনকার সরকার মুসলমানদের জন্য ভাববেন কেন? ওরা তো নিজেদের ধর্মমতে শান্তিতে থাকার জন্য ভারতমাতাকে ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান দেশ গঠন করেছেন। তারা দেশটিকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং ওই রাষ্ট্রে হিন্দুদের কোনও দাবি নেই বা কোনও অধিকারও নেই। এর পরেও ভারতের সরকার ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের দাবি মানবে কেন? ওরা ওদের অর্জিত দেশ পাকিস্তান বা বাংলাদেশে চলে যাক, ভারতবর্ষে কোনও দাবি ওরা করতে পারে না।" বিনয় কাটিয়ারের এই উক্তির ফলে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের সভ্যরা রাজ্যসভায় তীব্র হৈচৈ শুরু করেন। হৈহুল্লোড়ের পরে রাজ্যসভার কার্যকলাপ সেদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ বিচার করে দেখলেন না যে, বিনয় কাটিয়ার এক সত্য কাহিনিকে ভিত্তি করেই উক্তি করেছিলেন।

কাহিনি হলো— ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলি জিন্না সেই সময় ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে এক চিঠিতে লেখেন--- মুসলমান ধর্মালম্বীদের জন্য ভারতবর্ষ ভাগ করে এক মুসলমান দেশ গঠন করে দিতে হবে তবেই মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা মেনে নেবে। জিন্না সাহেব এই চিঠিতে তার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উল্লেখ করেছিলেন— ''Hindus and Muslims are two separate nation with different religions, philosophy, social customs and literature. These will be foundation of Pakistan Land."আরও লিখেছিলেন জিন্না সাহেব তার চিঠিতে— ''I also suggest an exchange of population and advise both the Hindus and the Muslims to move to the respective areas where they are in a majority." (Source : India State Creft-Vis-A-Vis. Secularism. Writer M.C. Molitra Page-70).

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাসংগ্রামের পর ব্রিটিশ সরকার সমগ্র ভারত শাসন করতে মনস্থ করে। সেই সময় তারা ভারতের জনসংখ্যা নিয়ে একটি সার্ভে করে। তার দৌলতে জানতে পারা যায় সেই সময় ভারতে প্রায় ৮৪ শতাংশ জনসংখ্যা হিন্দু, বাদবাকি ১৬ শতাংশ জনসংখ্যা ছিল মুসলমান এবং খ্রিস্টান। হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তার পরই মুসলমান। মুসলমানরাই শুধু সংখ্যালঘু ছিল না, সত্যিকারের সংখ্যালঘুরা ছিল খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-শিখ, যারা আজও ভারতবর্ষে বিদ্যমান। কিন্তু চরিত্রে মুসলমানরা অন্যরকম। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা ভারতবর্ষে থাকবে কিন্তু কোনওদিন 'ভারতমাতা' বলবে না। প্রাক্ স্বাধীনতাকালেও বলেনি। ১৯৪৭ সালের পর খণ্ডিত ভারতবর্ষে থাকছে কিন্তু বর্তমান ভারতকে 'ভারতমাতা' বলছে না বা বলবে না এবং কোনওদিনই বলতে রাজি হবে না। ১৯৪৭ সালের আগে অবিভিক্ত বাংলায় মুসলিম লিগের মুখপাত্র 'দৈনিক আজাদ'-এর সম্পাদক মওলনা আক্রাম খান আরব ভূখণ্ডকে মানুষের আদি মাতৃভূমি বলে প্রচার করতেন বা বলতেন, অথচ ভারতবর্ষকে মা বলে সম্বোধন— 'বন্দে মাতরম্' তার নিকট ছিল ইসলাম বিরোধী। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরও যে-সব মুসলমান ভারত ত্যাগ করেনি তাদেরও কোনও রূপান্তর ঘটেনি। আজও তারা বন্দে মাতরম্ বলতে গররাজি। এমনকী লোকসভায় এক মুসলমান সদস্য সরকারি অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণের তীব্র প্রতিবাদও করেছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতীয়

মুসলমানরা কিন্তু স্বাধীনতার লড়াইতে কোনও সহযোগিতা করেননি, বরং বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। ১৯০৫ সালে কার্জন বাংলা ভাগ করেছিলেন। হিন্দুরা তা মানতে পারেনি, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো। ঋষি অরবিন্দের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ হলেন ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা কোনও সহযোগিতা করলেন না, বরং মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব নিজামুদ্দিন সাহেবের প্রাসাদে ব্রিটিশ সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম লিগ পার্টি। মুসলমানদের কাছে ভারতবর্ষ হলো অ-মুসলমান অপবিত্র দেশ। অতএব ভারতবর্ষ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কাছে কখনও মাতৃভূমি হতে পারে না। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানরা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়নি। একথা স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ আমলে উচ্চপদে আসীন মুসলমান প্রশাসকরাও। ১৯১২ সালে গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সৈয়দ শ্যামসুল হুদা একটি প্রতিবেদনে হিন্দুদের দেশপ্রেম এবং মুসলমানদের মনোভাব সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদনে (অক্টোবর ১৯১২) লেখেন- ''There is a distinction between patriotic feerings of the Hindus and the Mohamedans. The patriotism of a Hindu consists in his love for his Country. Unfortunately for the Mohamedans they still look upon India as their land of adoption. Their patriotism is exte-territorial. It has its origin in a religious sentiment.'' (সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত প্রতিবেদন থেকে ড. পাপিয়া চক্রবর্তী এই মন্তব্যটি তার Hindu Response to Nationalist Fefmeat গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন)। তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে ইসলামপন্থীদের কাছে 'মুসলমান ধর্ম' প্রধান বিবেচ্য— তার পরে ভারত ভাবনা। আলিগড়ে দাঁড়িয়েই মুসলিম লিগের এক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বাংলার মুসলমান নেতা আব্দুল রহিম ঘোষণা করেন, 'হিন্দুরা ব্রিটিশ এবং মুসলমান উভয়েরই শত্রু', যদি ইংরেজ মুসলমানদের দাবিদাওয়া (পাকিস্তান) মঞ্জুর করে তাহলে মুসলমানরা তাদের (ব্রিটিশ) সমর্থন করায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

১৯০১ সালে লোকগণনার ভিত্তিতে মুসলমান প্রতিনিধিগণ সিমলায় ব্রিটিশ শাসনকর্তা মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় এক প্রতিলিপি দেন। তাতে তারা বলেন ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ। এই দেশে মানে ভারতে 'জড়োপাসক' ও নিকৃষ্টমানের ধর্মাচারণে অভ্যস্ত হিন্দুদের যদি গণ্য না করা হয় তাহলে মুসলমান সংখ্যানুপাত বেড়ে যাবে। মিন্টো সব শোনার পর ভবিষ্যতে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। মুসলমানদের ধর্মকে গুরুত্ব দিয়ে দাবি বহু বিশিষ্ট মুসলমান সমর্থন করেননি। যেমন— আবদুল কালাম আজাদ, আবদুল গফ্‌ফর খান। কিন্তু তাঁরা কেউই প্যান ইসলামি প্রাচীর ভাঙতে পারেননি। ভারত খণ্ডিত স্বাধীনতা পেলেও মুসলমানরা আজও ভারতে থাকবে, হিন্দুদের ঘৃণাও করবে। সম্প্রতি কলকাতায় অবস্থিত মল্লিক ব্রাদার্স প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ৫৫, কলেজস্ট্রিট মণিরুদ্দিন খানের অনুবাদে 'হিন্দুত্ব ও ইসলাম' বইয়ের ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছে, 'হিন্দুশাস্ত্র প্রকৃতিতে অশ্লীলতাপূর্ণ। এখানে যৌনগন্ধী নানা অবৈধ প্রেমের কাহিনি খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার আচরণে নগ্নমূর্তি বা চিত্র বিশেষ গুরুত্ব পায়, লিঙ্গপূজাও করা হয়। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেক কুৎসিত কথা লেখা আছে। স্বাধীন ভারতে হিন্দুদের এরকম অপমান সইতে হবে তা মানা যায় না। বিশেষ করে দেশের সংখ্যাগুরু মানুষ যেখানে হিন্দু। ■

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

বাগবাজার দত্ত পরিবারের ঐতিহ্যমণ্ডিত অন্নপূর্ণা পূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার বাগবাজার লক্ষ্মী দত্ত লেনের 'লক্ষ্মী নিবাস' শ্রীশ্রী সারদা মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী গহনানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শে ধন্য। শ্রীশ্রী সারদা মা তিন বার— ১৯০৪, ১৯০৯, ১৯১২ সালের ২৬ মার্চ অন্নপূর্ণা পুজোর দিন 'লক্ষ্মী নিবাস'-এ পদধূলি দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে 'লক্ষ্মীনিবাস' পরম তীর্থক্ষেত্র। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে দত্ত পরিবারের হৃদ্যতা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দত্ত পরিবার বাগবাজারের একটি অভিজাত এবং বনেদি পরিবার। পরিবারের আদিপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের নামাঙ্কিত এদের বাসভবন এবং সন্নিহিত রাস্তা। দত্ত পরিবারের অন্নপূর্ণা পুজো এবার ১২৭ বছরে পদার্পণ করলো। এত প্রাচীন পারিবারিক অন্নপূর্ণ পুজো কলকাতা শহরে বিরল। পুজোর বর্ণনায় যাবার আগে দত্ত পরিবার সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

দত্ত পরিবারের অন্নপূর্ণা পুজো শুরুর নেপথ্যে এক বেদনাদায়ক কাহিনির কথা জানা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তর মধ্যম পুত্র নগেন্দ্রনাথ দত্ত বিবাহের দু' বছর পরে মাত্র একুশ বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। রেখে যান এক শিশু সন্তান। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর অত্যন্ত স্নেহের এই পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। নগেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী চণ্ডিমণি দেবী তাঁর অকাল বৈধব্য জনিত শোক ভুলে থাকার জন্য শ্বশুরের কাছে গৃহে অন্নপূর্ণা পুজো করার বাসনা প্রকাশ করেন। শ্বশুরের সম্মতি পেয়ে চণ্ডিমণি দেবী ১২৯৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (ইংরেজি ১৮৯১ সালে) 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ অন্নপূর্ণা পুজোর সূচনা করেন। একাদিক্রমে তা ১২৭ বছর ধরে

অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১৯৭২ সালে দত্ত পরিবার বাসভবন ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করতে বাধ্য হন। একমাত্র সেবছরই 'লক্ষ্মীনিবাস'-এর বাইরে অন্নপূর্ণা পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা তৈরি হয়ে বাড়িতে আসার পরে পরিবারের সদস্যরাই সাজসজ্জার দায়িত্ব পালন করেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত অপরূপ মাতৃমূর্তি। ডানদিকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে মহাদেব দণ্ডায়মান। বামদিকে মহাদেবের সহচর 'নন্দী'। প্রতিমার উচ্চতা সাবেকি আড়াই হাত। অন্নপূর্ণা পুজোর দিন সকালে তন্ত্রধারক, 'ব্রতী' এবং পুরোহিত দোতলায় ঠাকুরঘরে গিয়ে শ্রীশ্রী সারদা মা-র কাছে পুজো শুরুর অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ইতিমধ্যে পরিবারের এক সদস্য ঝোলা নিয়ে বাড়ির মধ্যেই 'ভিক্ষা' করতে বের হন। সংগৃহীত ভিক্ষা সামগ্রী (চাল, আনাজ, ফল, অর্থ) সহ ঝোলা মহাদেবের দক্ষিণ হস্তে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

পর্যায়ক্রমে চক্ষুদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পুজো, অঞ্জলি প্রদান, ভোগারতি, হোমকুণ্ড প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সংকল্প হয় 'দত্ত পরিবার'-এর নামে। দত্ত পরিবারের অন্নপূর্ণা মাতা অত্যন্ত জাগ্রত। প্রতি বছরই পুজোয় কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যদিও দত্ত পরিবার এসব ঘটনাকে অলৌকিকতার অভিধা দিতে নারাজ। তাদের মতে, এসব মা অন্নপূর্ণার মহিমা।

অন্নপূর্ণ পুজোর দিন সকালে 'লক্ষ্মী নিবাস'-এর দোতলায় ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে পুজো করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানা যায়। ১৯১২ সালের ২৬ মার্চ অন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী সারদা মা 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ পদার্পণ করেছিলেন। ওই দিন তিনি অন্নপূর্ণারূপিণী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্বয়ং পুজো করে, স্বহস্তে তাঁকে অন্নভোগ নিবেদন করে বলেছিলেন, ''ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে দেখি তিনি গ্রহণ করেছেন''। কায়স্থ দত্ত পরিবারকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্নভোগ নিবেদন করার অধিকার দিয়ে শ্রীশ্রী মা নির্দেশ দিয়েছিলেন—''অন্নপূর্ণা পুজোর সঙ্গে ঠাকুরের এই পুজো করে যেও, বন্ধ করো না''। সেই পুজো আজও অব্যাহত। প্রথানুযায়ী, রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের একজন মহারাজ এই পুজোয় পৌরোহিত্য করেন। বছরে কেবল অন্নপূর্ণা পুজোর দিন সাধারণের ঠাকুরঘর দর্শনের সুযোগ মেলে। আগে অন্নপূর্ণা পুজোয় 'নারায়ণ সেবা'র ব্যবস্থা হতো। সহস্র ভক্ত অন্নপূর্ণা মাতার প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হতেন। এখন অবশ্য হয় না। তবে অন্নপূর্ণা পুজোর দিন 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ এলে কেউ অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যায় না। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার একবার অন্নপূর্ণা পুজোয় এসে সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে রাস্তায় বসে সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। অন্নপূর্ণা পুজোর পরদিন সন্ধ্যেবেলায় বরণ ও কণকাঞ্জলি দিয়ে মা অন্নপূর্ণাকে বিদায় জানানো হয়। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী, বাগবাজার অন্নপূর্ণা ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। ফিরে এসে শান্তিজল গ্রহণের পরে রামনাম সংকীর্তন হয়। জাঁকজকমের আধিক্য না থাকলেও দত্ত পরিবারে অন্নপূর্ণা পুজো অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারে সম্পন্ন হয়। ■

হর্ষ পোদ্দার
মহারাষ্ট্রের নতুন দ্রোণাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বছর চারেক আগেও অবস্থা ছিল ভয়াবহ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো জানিয়েছে শিশু অপরাধীর সংখ্যার বিচারে সারা দেশে মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। শুধু তাই নয়, মহারাষ্ট্রের অল্পবয়েসি ছেলেদের মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতাও বিপজ্জনক ভাবে বেশি। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশকে এর কারণ খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আশার কথা, পুলিশের অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে গত তিন বছরে কিছু সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনে কাণ্ডারি অনেকেই, কিন্তু যার কথা না বললেই নয় তিনি হর্ষ পোদ্দার। মালেগাঁওয়ের অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ সুপার হর্ষ পোদ্দারের উদ্যোগের ফলে মহারাষ্ট্রের ৪২০০০ যুবককে অপরাধ এবং সন্ত্রাসবিরোধী স্বেচ্ছাসেবকে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

কলকাতার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সের স্নাতক হর্ষ পোদ্দারের কাজের পরিধি বিশাল। স্বীকৃতিও পেয়েছেন সারা বিশ্ব থেকে। এর মধ্যে রয়েছে অভিজাত শেভেনিং স্কলারশিপ। যাদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা সহজাত তাদের মধ্যে সেরাদের এই স্কলারশিপ দেয় ব্রিটিশ সরকার। হর্ষের স্নাতকোত্তর পড়াশোনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ব্যালিওল কলেজে।

পড়াশোনা শেষ করে হর্ষ কর্পোরেট আইনজীবী হিসেবে লন্ডনের ক্লিফোর্ড চ্যান্সে যোগ দিলেন। কিন্তু হৃদয়বৃত্তি যাকে চালিত করে তিনি যে হৃদয়ের কাছাকাছি কোনও কাজ খুঁজবেন সেটাই স্বাভাবিক। হর্ষের কথায়, '২০১০ সালে আমি লন্ডনকে পাকাপাকি ভাবে বিদায় জানালাম। কারণ আমি সিভিল সারভ্যান্ট হতে চাইছিলাম।'

দেশে ফিরে হর্ষ দু'বার ইউপিএসসি-র পরীক্ষায় বসলেন। প্রথমবার ইন্ডিয়ান রেভেনিউ সার্ভিসের পরীক্ষায়। পাশ করলেন, কিন্তু ভালো লাগল না। পরেরবার ২০১৩ সালে তিনি বসলেন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের (আইপিএস) পরীক্ষায়। সারা ভারতে তাঁর র‍্যাঙ্ক হলো ৩৬১। ব্যাস, আর পিছনে ফিরে তাকাবার দরকার হলো না।

কচিকাচাদের সঙ্গে হর্ষ পোদ্দার।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিংয়ের সময় হর্ষ একটা প্রোজেক্ট করেছিলেন। প্রোজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল অন্ধ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে করা একটি ওয়ার্কশপ। বস্তুত এই ওয়ার্কশপটি তাঁকে অন্যান্য অফিসারদের থেকে অনেকটাই আলাদা করে দিয়েছে। ওয়ার্কশপে তিনি প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে যে-যার নিজের মতো করে খসড়া আইন রচনা করতে বলেছিলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে হর্ষ লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সাহায্যে ও অনুপ্রেরণায় ছেলে-মেয়েরা বিষয়টির গভীরে যেতে পারছে। এই অভিজ্ঞতা মহারাষ্ট্র পুলিশের উচ্চপদে যোগ দিয়েও হর্ষ ভোলেননি। আরও পরে মহারাষ্ট্রের ডিজিপি যখন তাঁকে শিশুদের অপরাধ প্রবণতা কমানোর জন্য আইডিয়া দিতে বলেন তখনও হর্ষের ট্রেনিং অ্যাকাডেমির সেই অন্ধ ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়েছিল। তাঁর পরামর্শে মহারাষ্ট্রে ইয়ুথ পার্লামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হলো। এই উদ্যোগের লক্ষ্য পড়াশোনা কেরিয়ার ইত্যাদির চাপে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কিশোর এবং যুবকদের অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা থেকে রক্ষা করা। তার জন্য সমাজবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদী মঞ্চ তৈরি করা হলো।

দক্ষ পুলিশ অফিসারদের তত্ত্বাবধানে পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হয়েছিল অওরঙ্গাবাদের নাথ ভ্যালি স্কুল এবং পুলিশ পাবলিক স্কুলে। নির্বাচিত ছাত্রদের তিনটি দলে ভাগ করে তাদের অপরাধ সংক্রান্ত নানা বিষয় যেমন যৌন অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, মাওবাদ, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অপরাধ ইত্যাদি আলোচনার জন্য দেওয়া হয়। প্রত্যেক দল সরকার, পুলিশ বা নাগরিক সমাজের ভূমিকা গ্রহণ করে অপরাধদমনে তাদের কী দায়িত্ব নেওয়া উচিত সেই ব্যাপারে মতের আদানপ্রদান করে। যে-দিন যে-দলের যে-ভূমিকা, তার ভিত্তিতে তাদের কাছে সমস্যার সমাধান চাওয়া হয়। তাতে তারা নিজেদের মতো করে সমাধানের রাস্তা বলে।

হর্ষ পোদ্দারের প্রয়াস এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সম্প্রতি তিনি উড়ান নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পে স্থানীয় যুবকদের পড়াশোনা এবং কেরিয়ার তৈরির ব্যাপারে নানারকম পরামর্শ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে মালেগাঁও অঞ্চলের যুবকদের ওপর হর্ষ পোদ্দারের প্রভাব যথেষ্টই বেশি। সম্প্রতি ভীমা-কোরেগাঁও ইস্যুতে সারা মহারাষ্ট্র উত্তাল হয়ে উঠলেও মালেগাঁওতে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। কারণ দ্রোণাচার্য হর্ষ পোদ্দারের ছাত্ররা তখন দেশের যুবসমাজের প্রধান শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। হর্ষ তাদের দেশকে মা ভাবতে শিখিয়েছেন। এই শিক্ষা পেলে কেই বা আর প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়! ■

গিরীশচন্দ্র ঘোষের ১৭৫ তম জন্মদিবসে মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটারের য্যায়সা কা ত্যায়সা

কণিকা দত্ত

বিনোদনটাই বড় কথা। তখনও বাংলার রঙ্গমঞ্চ শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য হয়নি। তাই 'লোকশিক্ষে'র দায় ও দায়িত্ব খুব একটা বড় হয়ে দেখা দেয়নি তৎকালীন থিয়েটারওয়ালাদের কাছে। বাবু কলকাতার বনেদিয়ানার অন্যতম বিলাস ছিল যাত্রা বা থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা। ঊনবিংশ শতকের পুরুষসমাজ তাতেই মজে থাকত বেশিরভাগ সময়। কবিগান, খেউড়, যাত্রা বা থিয়েটার ছিল প্রধানত বারমহলের বিনোদন। অন্দরমহল থাকত পর্দার ওপারে। হ্যাজাকের আলোয় জোর বাড়তে আর অন্তঃপুরবাসিনীদের রূপটানের শেষ পোচ পড়তে সময় লাগত বেশ। দাঁ, দত্ত, রায়, মল্লিকদের বাড়ির দালানে বাঁধা মঞ্চের আসরে 'লোক টানতে' তাই থিয়েটার কোম্পানিগুলি 'রিজার্ভ আর্টিস্ট'দের মঞ্চে হাজির করে শুরু করে দিত নাটকের আগে নাটক। যেগুলিকে বলা হতো পঞ্চরং। চড়া দাগের, স্থূল হাসির নাটিকাগুলি 'আসর গরম' করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল সেদিন।

পরবর্তীকালে নট ও নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই রকম বেশ কয়েকটি 'পঞ্চরং' লেখেন এবং জনপ্রিয় হয়। যেগুলির মধ্যে য্যায়সা কা ত্যায়সা' অন্যতম। সম্প্রতি গিরীশচন্দ্র ঘোষের ১৭৫ তম জন্মদিবস উপলক্ষে গিরিশ মঞ্চে 'পঞ্চরং'টি পুনঃপ্রযোজনা করল মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটার।

বেজায় কিপটে হারাধন চায় মেয়ে রতনকে বরাবরের মতো নিজের কাছে রেখে দিতে। সেই ধান্দায় ঘরজামাই হতে প্রস্তুত এমন শাঁসালো পাত্র খুঁজছেন তিনি। কারণ, মেয়েকে বড়ো করতে, মানুষ করতে বিস্তর খরচ এই ক'বছরে। তাই রাজপুত্র ও রাজত্ব তার একসঙ্গে চাই।

কিন্তু সমাজ বুঝলে তো সে কথা! এদিকে মেয়ের মেঘে মেঘে বেলা হলো বেশ। উভয় সঙ্কট হারাধনের।

ওদিকে রতন আবার চুপিচুপি মন দিয়ে বসে আছে রসিককে। কিন্তু সেকথা কি মুখে বলা যায়? রতনদিদির ভাবসাব, রকমসকম দেখে কেমন যেন সন্দেহ গরবের। কিন্তু সরাসরি কিছু

য্যায়সা কা ত্যায়সা-র একটি দৃশ্য।

জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। শত হলেও সে দাসী। তবে দাসী হলে কী হবে গিন্নিহীন সংসারে তার দাপট কিছু কম নয়। দুই সহকর্মী এলোকেশী ও দাইয়াকে নিয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটনে নামে গরব।

অনেক ছলাকলা, রঙ্গরসিকতার পর রতন শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে রসিক সমাচার। কিন্তু বাবু জানলে কী হবে। ফন্দি আঁটে গরব, দাইয়া, এলোকেশী।

হারাধন বাড়ি ফিরে দেখে মেয়ের এখন-তখন অবস্থা। ডান হাত মানকেকে পাঠায় ডাক্তার ডাকতে। পথে মানকে গরবদের খপ্পরে পড়ে। মানকে আবার গরবকে দেখলেই কেমন যেন হয়ে পড়ে। সেই দুর্বলতাটাকে কাজে লাগায় দাইয়া, এলোকেশীরা।

এদিকে শহরে যত রকম চিকিৎসা পদ্ধতির ডাক্তার আছে তাদের সাবাইকে ধরে নিয়ে আসে মানকে। এমনকী বাদ যায় না তান্ত্রিক ও শাক্ত। চিকিৎসার মত ও পথ নিয়ে শুরু হয় তুমুল দ্বন্দ্ব। হারাধনের বাড়ি তখন কুরুক্ষেত্র। সবাই বিদেয় হলে বাড়িতে এসে হাজির হয় এক 'যোগীবাবা'। এই সাধুবেশী ভণ্ডটি আর কেউ নয়, রসিক। সে যোগবলে রোগীকে দোতলার ঘরের বিছানা থেকে 'উপড়ে' নীচে নিয়ে আসে। বাবার এহেন মাহাত্ম্যে আত্মহারা হারাধন। 'বাবা' বিধান দেন, এখনই বিয়ে দিতে হবে মেয়ের। না হলে সর্বনাশ! এত অল্প সময়ের মধ্যে পাত্র কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়।

উপায় বাতলে দেন 'বাবা' স্বয়ং। যদিও তিনি নারীঅঙ্গ স্পর্শ করেন না, তবুও 'কন্যার' কথা ভেবে 'অনুকল্প' বিবাহে তিনি রাজি।

মুহূর্তে জোগাড় হয়ে যায় পুরুত থেকে শুরু করে বিয়ের যাবতীয় সরঞ্জাম। 'অনুকল্প' কন্যাদান করেই স্বমূর্তি ধারণ করে হারাধন। মেয়ে ফেরত চাই। কিন্তু বাবা ওরফে রসিকের যুক্তি অগ্নির তো 'অনুকল্প' হয় না। তাই অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা বউ ফেরত দেওয়া যাবে না। বিস্মিত হারাধন দেখে মেয়েরও তাই মত। অগত্যা 'অনুকল্প' বিয়েই মেনে নিতে বাধ্য হয় হারাধন।

আদ্যপান্ত হাসির নাটক। মূল বিষয়কে অপরিবর্তিত রেখে আধুনিক আঙ্গিকে নাটকটির মঞ্চায়ন রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটারের শিক্ষার্থী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রাণবন্ত অভিনয় নাটকটির সম্পদ। প্রায় বিলুপ্ত একটি নাট্য আঙ্গিক নতুন মোড়কে মঞ্চে ফিরিয়ে এনে প্রশংসিত কাজ করল মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটার তাতে সন্দেহ নেই। ■

মনীষী কৌতুক

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। স্কুলে ড্রাম ভর্তি রসগোল্লা এসেছে। তিনি ছাত্রদের বললেন, ''এই

ড্রামের সব রসগোল্লা তোমাদের মধ্যে কে সাবাড় করতে পারবে?'' তখন সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। হঠাৎ একজন শিক্ষার্থী চিৎকার করে বলল, 'স্যার। আমি পারব।' পরমুহূর্তেই চাপাস্বরে বলল, 'তবে একদিনে নয়।' সেদিনের সেই ছাত্রটির নাম ছড়াকার সুকুমার রায়।

রবিঠাকুর

শান্তিনিকেতনে রবিঠাকুর ছাত্র পড়াচ্ছেন। ক্লাসের বাইরে এক ছাত্র হাতে নিমের ডাল নিয়ে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন কবি তাকে 'নিমাই'

সম্বোধনে ডাকলেন। এই কথা ক্লাসের উপস্থিত ছাত্ররা শুনলো। একজন শিক্ষার্থী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''গুরুদেব, কাল থেকে আমি যদি 'জাম গাছের' ডাল নিয়ে ক্লাসের বাইরে ঘুরে বেড়াই আমাকে কী বলে ডাকবেন?' তখন রবিঠাকুর তাকে বললেন, 'তখন তোমাকে আর ডাকা চলবে না বাপু'। সেদিনের সেই প্রত্যুৎপন্নমতি ছাত্রটিই প্রমথনাথ বিশী।

বিদ্যাসাগর

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন দারুণ অর্থকষ্টে ভুগছিলেন তখন বিদ্যাসাগর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একদিন এক মাতাল বিদ্যাসাগরের কাছে এসে সাহায্য প্রার্থনা করল। বিদ্যাসাগরের সাফ সাফ জবাব তিনি কোন মাতালকে সাহায্য করতে

রাজি নন। তখন ওই মাতাল জানাল যে বিদ্যাসাগর তো মধুসূদনকে সাহায্য করেন। কিন্তু মধুসূদনও তো মদ খান। তখন বিদ্যাসাগরের জবাব ছিল, ''তুমি ওর মতো 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখে আন। তোমাকেও সাহায্য করব।''

বঙ্কিমচন্দ্র

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাইভা দিতে হলো। তাঁকেও যথারীতি বাংলার উপরে পরীক্ষা দিতে হলো, তবে সেখানে পরীক্ষক একজন জাত ইংরেজ। প্রথমেই তিনি বঙ্কিমকে প্রশ্ন

করনে, ''ওয়েল! বলতে পারো, হোয়াট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বিপড অ্যান্ড আপড?'' বঙ্কিমবাবু হেসে বলেছিলেন, ''অবশ্যই একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলছি। পদ্মায় একবার স্টিমারে করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ, শুরু হলো ঝড়। সেটা হলো বিপদ। আর এই যে

আজ আমার মতো একজন বাঙালিকে তোমার মতো ইংরেজের কাছে বাংলা ভাষার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে— এটা আপদ।''

শরৎচন্দ্র

শরৎবাবুর কাছে দুজন লোক এসেছেন।

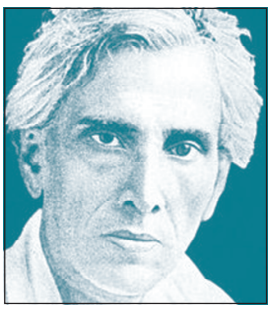

তারা শরৎচন্দ্রের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করলেন আর রবীন্দ্রনাথের লেখার সমালোচনা করলেন, কারণ তা নাকি দুর্বোধ্য। তখন শরৎবাবু বললেন, ''আমি লিখি আপনাদের জন্য আর রবিবাবু লেখেন আমাদের জন্য।''

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে তর্কে

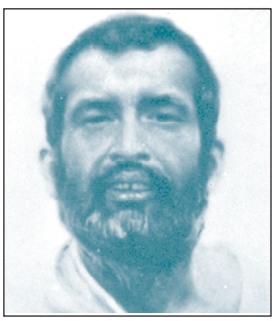

হেরে গিয়ে এক সাধু রাগ করে বললেন, ''আমি ত্রিশ বছর সাধনা করে এখন হেঁটে নদী পার হতে পারি। আপনি কী পারেন?'' তখন রামকৃষ্ণ একটু হেসে বললেন, ''যেখানে এক পয়সা দিলেই মাঝি আমাকে নদী পার করে দেয়, সেখানে এর জন্য ত্রিশ বছর নষ্ট করার পক্ষপাতী আমি নই।''

প্রণব দত্তমজুমদার

ভারতের পথে পথে

বৈশালী

বিহারের বৈশালী অতি প্রাচীন একটি গণরাজ্য রূপে খ্রিস্টের জন্মের ৬০০ বছর আগেও অস্তিত্ব ছিল। লিচ্ছবিরাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিশালের নাম থেকে রাজের নাম বিশালপুরী কালে কালে বৈশালী হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ ৩ বার বৈশালী এসেছেন। প্রথমে পড়াশুনা করতে, মাঝে ধর্মপ্রচার এবং জীবনের শেষে উপদেশ দিতে। বুদ্ধের নির্বাণের ১০০ বছর পর দ্বিতীয় বৌদ্ধ ধর্মসংসদ বসে বৈশালীতে। বৈশালীর চারপাশে ১৩টি বৌদ্ধস্তূপ গড়ে উঠেছিল। আজ তার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। বৈশালী বর্তমান বিহারের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। বৈশালীর অনতিদূরে সম্রাট অশোকের তৈরি অশোক পিলার দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় মানুষ একে 'ভীমের লাঠি' নামে জানে।

জানো কি?

- দৈর্ঘ্য পরিমাপের সহজলভ্য যন্ত্র—মিটার স্কেল।
- সরাসরি বস্তুর ওজন নির্ণায়ক যন্ত্র-নিক্তি।
- সূক্ষ্মভাবে ওজন করার যন্ত্র—তুলাযন্ত্র।
- জাহাজের দিক নির্ণায়ক যন্ত্র—জাইরোকম্পাস।
- শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র—অডিয়োমিটার।
- ভূকম্পনের তীব্রতা পরিমাপক—রিখটার স্কেল।
- বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র—রেইনগেজ।

ভালো কথা

কৌশিকের প্রজেক্ট

আমার মামার বাড়ি পুরুলিয়া শহরের ধবঘাটায়। মামাতো ভাই কৌশিক আমার বয়সি। নাইনে পড়ে। জল যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য কৌশিক ওর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিটি খোলা ট্যাপকলের মুখে একটা কাঠিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে কলের গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছে, যাতে লোকের জল নেওয়া হয়ে গেলে কলের মুখে গুঁজে দেয়। ওরা সবাইকে বুঝিয়েছে জল নষ্ট করা চলবে না। যারা জল নিত তারা প্রথম প্রথম বুঝতে পারত না। তাই সকাল-বিকেল জল আসার সময়ে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে বোঝাতে শুরু করেছে। এখন জল নেওয়া হয়ে গেলে সবাই ন্যাকড়া বাঁধা কাঠিটি কলের মুখে গুঁজে দিচ্ছে। এর ফলে এখন উপরের দিকে অর্থাৎ গোশালা ও রাঘবপুর মোড়ের দিকের লোকেরাও জল পাচ্ছে। কৌশিকদের প্রশংসায় পাড়ার লোকেরা এখন পঞ্চমুখ।

স্নেহাংশু চক্রবর্তী, নবম শ্রেণী, দুবরাজপুর, বীরভূম।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন অ ধ কা বো	(১) দ বি স হা তি ই
(২) ক আ য় ন ন্দ	(২) গী রা নু রা শ্ব ঈ

১২ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) বিচারবিবেচনা (২) বাদবিসংবাদ

১২ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) ব্যাকরণবিধি (২) মঙ্গলাচরণ

উত্তরদাতার নাম

(১) প্রত্যুষা দেবনাথ, গাইঘাটা, উঃ ২৪ পরগনা। (২) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৩) অর্ঘ্য কমল সাঁই, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (৪) রাজা সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

পরলোকে রথীন্দ্রকুমার দাশ

গত ১৪ মার্চ লোকান্তরিত হলেন বারাসাতের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রথীন্দ্রকুমার দাশ। দুরারোগ্য কর্কটরোগে তিনি আক্রান্ত

ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রেখে গেলেন সহধর্মিণী, ২ পুত্র, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি লেদার টেকনোলজিস্ট ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মহকুমা কার্যবাহের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। বনবন্ধু পরিষদের অঞ্চল সমন্বয় প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মুখপাত্র 'কল্যাণ ভারতী'র সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করেছেন। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বাণপ্রস্থী কার্যকর্তারূপে আন্দামানে সেবারত ছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সাঁই সমিতি, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ প্রভৃতি সামাজিক সংগঠনের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বড় পুত্র রজত কুমার দাশ স্বয়ংসেবক এবং ছোট পুত্র ড. রাকেশ দাশ প্রজ্ঞা প্রবাহ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংযোজকের দায়িত্বে রয়েছেন।

শোকসংবাদ

কলকাতা উত্তর দমদম নগরের শারীরিক প্রমুখ সত্যজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী নিভা গঙ্গোপাধ্যায় গত ৯ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর ব্যারাকপুর নগরের শারীরিক প্রমুখ দেবদীপ ভৌমিকের ঠাকুমা মায়ারানি ভৌমিক গত ১ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ নেমানির পিতৃদেব দুর্গাদত্ত নেমানি গত ২৪

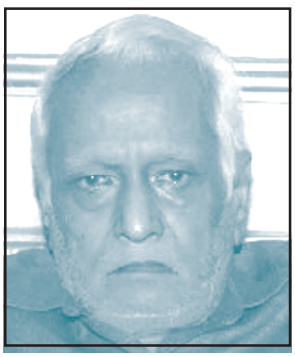

ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৩ কন্যা, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাংগঠনিক কাটোয়া জেলার জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ জয়ন্ত বিশ্বাসের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর বাবা জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস ও মা শ্রীমতী মঞ্জু বিশ্বাস জেলা সম্পর্ক প্রমুখ পূর্ণেন্দু দত্তের হাতে। অনুষ্ঠানে কাটোয়া জেলার জেলা প্রচারক বিশ্বজিৎ দাস, সেবা প্রমুখ রামকৃষ্ণ পাল, কাটোয়া নগর কার্যবাহ তন্ময় মুখার্জী, মেদিনীপুর জেলা প্রচারক বরুণ ঘোষ-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারটোলির সদস্য তথা ব্যারাকপুর নগরের স্বয়ংসেবক প্রণয় রায়ের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে গত ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর বাবা বিদ্যুৎ রায় ও মা শ্রীমতী স্বপ্না রায় নববধূ অনামিকার হাত দিয়ে। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয়-সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্তের হাতে তাঁরা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ডোমজুড় খণ্ডের শারীরিক প্রমুখ অরুণ আটার দাদা বরুণ আটার কন্যা শ্রেষ্ঠার শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁদের মাতৃদেবী প্রভাতি আটা ডোমজুড় মহকুমা কার্যবাহর হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে আত্মীয়, বন্ধু ছাড়াও বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালবাটি মণ্ডলের মুনইল শাখার স্বয়ংসেবক বিপ্লব মণ্ডল তাঁর কন্যা রুপাঞ্জনার 'মুখেভাত' অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত প্রাচরক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরীর হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৭ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলা জেলার ইন্দপুর খণ্ডের আসনবনি শাখার স্বয়ংসেবক ধনঞ্জয় পতির শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর মা জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৫ মার্চ বর্ধমান জেলার ভাতার খণ্ডের সেবাপ্রমুখ ভরতচন্দ্র পাল পুত্রের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন বর্ধমান বিভাগ সেবা প্রমুখ সুব্রত সামন্তর হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৭ মার্চ বাঁকুড়া জেলার সম্পর্ক প্রমুখ সৌরভ পাত্রের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর বাবা মুরলীধর পাত্র ও মা মিনতি পাত্র জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েক-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
26 March - 2018 - Rs. 10.00

पहली बार श्रमिकों के लिये ऐतिहासिक योजनाएं

योजनाओं के लाभ के लिये श्रमिकों का पंजीयन 1 अप्रैल से

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रुपये। प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रुपये जमा किये जायेंगे।
- घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये की सहायता।
- श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत/नगरीय निकाय से 5 हजार रुपये की नगद सहायता।
- गंभीर बीमारी से ग्रस्त श्रमिकों के लिए प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था। जरूरी होने पर बड़े शहरों में भी इलाज का इंतजाम।
- हर श्रमिक को मकान। तीन साल के अंदर यह काम पूरा होगा। शहरों में श्रमिकों को पक्के मकान। गांवों में श्रमिक परिवारों को भूमि के पट्टे और पक्का मकान बनाने के लिये राशि।
- श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पब्लिक स्कूल की तर्ज पर श्रमोदय विद्यालय।
- श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर डाक्टरेट तक पूरी पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी। इसमें इंजीनियरिंग, मेडीकल तथा नामचीन प्रबंधन संस्थान भी शामिल होंगे।
- प्रतिष्ठित सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये असंगठित श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को बेहतरीन संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग।
- स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले श्रमिकों को एक वर्ष का प्रशिक्षण और बैंक ऋण। ऋण पर सब्सिडी और ऋण की गारंटी सरकार द्वारा।
- हर साल एक लाख श्रमिकों को स्वरोज़गार के लिए ऋण।
- श्रमिकों को स्वरोज़गार के लिये प्रशिक्षण, ऋण पर सब्सिडी। ऋण की गारंटी सरकार लेगी।
- छोटे-मोटे कामधंधों में लगे श्रमिकों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण केन्द्र। इनमें अकुशल श्रमिक बनाये जायेंगे कुशल।
- साइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-रिक्शा और हाथठेला चलाने वाले को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल। 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी।
- शहरों में छोटे-मोटे काम करने वालों को साइकिल के लिये चार हजार रुपये की सहायता।
- असंगठित श्रमिक परिवारों को बिजली कनेक्शन। उनसे 200 रुपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली।
- तेंदूपत्ता तोड़ने, महुआ के फूल एवं चिरौंजी बीनने वाली श्रमिक बहनों को चरण पादुका योजना के तहत जूते-चप्पल और प्यास बुझाने के लिये ठण्डे पानी की कुप्पी।

> आर्थिक असुरक्षा से जूझते असंगठित श्रमिक बहनो, भाइयो की बेहतरी के लिए हम संकल्पित हैं। उन्हें आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक बेहतरी, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिये पंजीयन अवश्य करायें।
पोर्टल
shramsewa.mp.gov.in
पर पंजीयन करवाएं।

असंगठित श्रमिक कौन?

कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुएँ और जूते बनाने वाले, ऑटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक।

श्रमिक जो असंगठित, सुरक्षित उनके भी हित

/CMMadhyaPradesh /CMMadhyaPradesh

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।